সুবর্ণদ্বীপ

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

পরিবেশক

বুক হোম

৩২ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯

"SUBARNA DWEEP"

প্রকাশক :
বিশ্বজিৎ মজুমদার
গ্রন্থগৃহ
২২ সি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬২

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী উমা বসাক
নারায়ণ প্রেস
১০৭।২, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

প্রয়াত কথাশিল্পী

বিশু মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

এক

বিরাট এক দেশ। তার তিনদিকে থইথই করছে তিন সমুদ্র। তিন সমুদ্রের তিন রঙ। আর একদিকে থইথই করছে পাহাড়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন পাহাড়ের ঢেউ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কেউ জানে না। সে সব তুষারের রাজ্য বরফের রাজ্য—সেখানে কেউ যেতে পারে না। দেশটার নাম সুবর্ণদ্বীপ। সেই দেশের রাজার খুব নামডাক, ভীষণ তাঁর পরাক্রম। রাজার নাম ধনপতি। রাজার পরমাসুন্দরী তিন রানী। বড়রানী অগ্নিদ্বীপের রাজকন্যা নাম বিদ্যুৎপর্ণা, মেজরাণী রত্নদ্বীপের রাজকন্যা রত্নমালা আর ছোটরানীর চটক দেখে কে! তাঁর মত রূপসী তখনকার কালে আর একজনও ছিল না কোথাও। তিনি ধনকুবের যক্ষরাজের এক মাত্র কন্যা, নাম মধুমতী।

বড়রানীর একটি ছেলে। সেই সকলের বড়। তার নাম মকর-কুমার। মেজরানীরও এক ছেলে, সে মেজ। তার নাম কুবেরজিৎ। আর ছোটরানীর একটি মাত্র মেয়ে। সে মেয়ের দিকে তাকালে সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়। চাঁদের মতন তার মুখ, ডালিম ফুলের মতন লাল ঠোঁট, পাকা আপেলের মত গাল। আর চুল? এক ঢাল চুল যেন শ্রাবণ মাসের মেঘকেও লজ্জা দেয়! রাজকন্যা কথা কইলে কোকিল মুখ গোঁজ করে চুপ করে যায়। বীণা, বেহালার মতন বাজনাগুলো আর কখনো বাজবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে। এমনি মিষ্টি রাজকন্যার কথা, এমনি মধু-ঝরা তার গলার স্বর। রাজকন্যা হাসলে তার দাঁত থেকে এক অপরূপ জোছনা ঠিকরে পড়ে। তখন আকাশে চাঁদ থাকলে লজ্জায় মেঘের আড়ালে মুখ লুকোয়। তার মুখের ওপর যখন-তখন ভ্রমর মৌমাছিরা বসতে চায় পদ্মফুল মনে করে। সকালে ফুলবাগানে গেলে

চারদিক থেকে রঙবেরঙের প্রজাপতি তার চারপাশে পাক দিতে থাকে, তার মুখে বসতে চায় ফুল মনে করে।—এমনি তার রূপ।

রাজকন্যার কত নাম। সকলের চোখের মণি। সবাই ডাকে মণিদীপা বলে। শুধু রাজা মশাই ডাকেন লক্ষ্মী বলে। সসাগরা পৃথিবীর রাজা ধনপতি। রাজাদেরও রাজা অন্য সব রাজারা তাঁর অধীন, তাঁকে কর দিতে হয় সব রাজাদের ; যুদ্ধ হলে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হয়। এক ডাকে রাজসভায় এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে অন্য সব রাজারা বলেন —আজ্ঞা করুন! আদেশ করুন!!

রাজার হাতিশালে হাজার হাজার হাতি, ঘোড়াশালে লক্ষ লক্ষ ঘোড়া, শিবিরে শিবিরে, দুর্গে দুর্গে অযুত অযুত রথ, নিযুত নিযুত সৈন্য আর সারা রাজ্যে কোটি কোটি প্রজা।

ফলে, শস্যে; ধনরত্নে ঝলমল করছে সুবর্ণদ্বীপ।

তোমরা নিশ্চয়ই মনে করছ—এমন রাজা হতে না পারলে আর সুখ কিসে। এ-রাজার মতন আর সুখী কে আছে? এমন মজা আর কার?—উঁঃ-হুঁঃ! মোটেই তা নয়। আমাদের এ-রাজার মনে সুখের 'স' পর্যন্ত নেই, সুখের চিহ্নের 'চ' পর্যন্ত নেই।

কারণ কি? কারণ আছে। কারণ রাজকন্যা। কারণ রাজকন্যা এক কাণ্ড করে বসেছে। মনের মতন রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর অমন মেয়ের বিয়ে হোক, এই চেয়েছিলেন রাজা। তাই সারা পৃথিবীর সব রাজা আর রাজপুত্রদের নেমন্তন্ন করে এনেছিলেন, বসিয়েছিলেন স্বয়ংবর সভা। সারা পৃথিবীর সব বড় বড় সুন্দর রাজা আর রাজপুত্ররা ইন্দ্রের মতন সাজগোজ করে সার দিয়ে গোল হয়ে মালার মতন বসেছিলেন সেই সভায়। রাজকন্যার যাকে পছন্দ হবে তার গলায় মালা দেবেন তিনি। আর তাহলেই রাজা মহাধুমধাম করে তাঁরই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। কিন্তু হল কি? রাজকন্যা মালা হাতে করে ঘুরে ঘুরে সব রাজা আর রাজপুত্রদের দেখলেন। তাঁর সহচরীরা সব রাজার নামধাম, পরিচয় দিল রূপগুণের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলল। সকলের কথাই শুনলেন

রাজকন্যা, মৃদু মৃদু হেসে অভিবাদন করলেন। নমস্কার জানালেন সবাইকে। কিন্তু না। কাউকেই মালা দিলেন না, কারুর গলাতেই রাজকন্যার মহামূল্য মালা দুলল না। ভদ্রভাবে, বিনয়ের সঙ্গে রাজকন্যা সবাইকে প্রত্যাখ্যান করলেন, কারুকেই পছন্দ করলেন না।

রাজকন্যা মালা ফিরিয়ে আনছেন দেখে সবাই তো 'থ'! হল কি? রাজার মুখে যে চুনকালি পড়ল। রাজা ভীষণ চটে গেলেন। রাজা বিরক্ত হয়েছেন যেই না শোনা অমনি রাজকন্যা মণিদীপা তার গোসাঘরে গিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলেন। সেই যে দোর বন্ধ করলেন তো তিনদিন তিনরাত জল পর্যন্ত খান নি, কারুর সঙ্গে কথা বলেন নি, দেখাই করেন নি—শুধু ছোটরানীকে তার ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলেন দু-দিনের দিন।

তিনদিনের দিন সকালে রাজা শুকনো মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজসভা থেকে উঠে গেলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকুমাররা, পাত্র-মিত্র প্রজারা, সব মাথা হেঁট করে রইল। এমন দেবতার মতন রাজার একি দুঃখ! সুখ কি কারুর কপালেই থাকে না চিরকাল? রাজসভায় যেন শোকের আঁধার নেমে এল। কেন এমন হল?

কি চায় রাজকন্যা? সকলের মুখেই এক কথা। কেন, কেন আর কেন? কি চায় রাজকন্যা? কি—কি—কি—কি—! রাজা উঁচু মাথা হেঁট করে বড়রানীর মহলে গেলেন। মহল খাঁ-খাঁ করছে। জন-মানব শূন্য। দাঁড়ালে গা ছমছম করে। তখন রাজা গেলেন মেজরানীর মহলে। সে মহলও থমথম করছে। খাঁচায়-খাঁচায়, দাঁড়ে-দাঁড়ে টিয়া, চন্দনা, ময়না, হীরামন আর কাকাতুয়া পাখিরা বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। বাগানে ময়ূরগুলো চুপচাপ। পেখম ধরে নি—রাজহাঁস-গুলো জলে নামে নি।

দেখেশুনে রাজা গেলেন ছোটরানীর মহলে। দেখলেন সে-মহল ঝিম-ঝিম করছে, সকালেই মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত নিস্তব্ধ নিঃঝুম। নিজের গায়ের শব্দেই চমকে উঠতে হয়। যেন ভুতুড়ে বাড়ি! একটু দাঁড়ালে গায়ে কাঁটা দেয়, বুক ঢিপঢিপ করে।

সবাই কোথায় গেল এই সক্‌কাল বেলায়! কোথায় আবার, রাজকন্যার মহলে তাঁর গোসাঘরের দরজায় সবাই ধর্ণা দিয়েছে। সবাই ডাকাডাকি করছে—সোনামণি বেরিয়ে এস! দেখ, তোমার জন্যে সকলের কি অবস্থাটাই না হয়েছে!

রান্নাশাল বন্ধ, ভাঁড়ার খোলা। দুধ-দই-ক্ষীর রাজভোগ সব থরে থরে সাজানো। কেউ ছোঁয়ও নি।

কালিয়া, পোলাও, মাছ, মাংস, ফলমূল, আঙুর, আম সব পড়ে পড়ে পচছে। আমরা সবাই উপোস করে রয়েছি! রাজবাড়ি মরুভূমি হয়ে গেছে—দেখ এসে! তুমি এ-রাজ্যের লক্ষ্মী! সোনার প্রতিমা! তুমি রাগ করলে সব রসাতলে যাবে!

এমন সময়ে রাজা এসে দাঁড়ালেন। সবাই পথ ছেড়ে দিল। রাজা দেখলেন সকলের মুখ শুকনো, চোখে জল। সকলে দেখল রাজার মুখ শুকনো; চোখের কোলে কালি।

রাজা বাইরে থেকে ডাকলেন—মা, আমার মাথার মণি! তুমি ছাড়া আমার রাজ্য যে অন্ধকার মাগো!

কোনো সাড়া নেই।

রাজা আবার বললেন, আমি একবার ঘরের ভেতরে যাব ?

একটুখানি চুপচাপ তারপর শাড়ি আর গয়নার খসখস টুংটাং শব্দ। তারপর ফিস্‌ফিস্ কথা। আর তারপরেই ছোটরানী ঘরের দরজা খুলে দিলেন। রাজা ঘরের ভেতরে গেলেন। দেখলেন, রাজকন্যা সোনার ময়ূরপঙ্খী খাটের পালকের বিছানায় তো নেইই, ঘরের মেঝের মখমল সরিয়ে খালি মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। রাজার বুকটা হু-হু করে উঠল।

রাজা হওয়ার পরে এই প্রথম রাজা ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ে রাজকন্যার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, আমার মার কি হয়েছে ? কেন অমন করলি মা ? অত বড় বড় রাজা আর রাজপুত্ররা সব আমার নেমন্তন্ন পেয়ে এলেন! কি তাঁদের রূপ-যৌবন! কি তাঁদের ধনদৌলত! শৌর্যে-বীর্যে সব ইন্দ্রের মতন! তাঁদের কাউকেই তোর মনে ধরল না! তুই কি স্বর্গের দেবতাকে চাস! আমি পৃথিবীর বাইরের কারুকে তো আনতে পারব না মা! অপমানে আমার উঁচু মাথাটা যে হেঁট হয়ে গেল! লক্ষ্মী সোনা, তোর মনের ইচ্ছাটার কথা খোলাখুলি বল দিকি! তোর জন্য আমি কিনা করতে পারি!—

এবার রাজকন্যা একটু নড়ল-চড়ল। তারপর বলল চুপিচুপি। মনে হল যেন দূরের ঝর্ণার জলের শব্দ হচ্ছে। রাজামশাই তাঁর কানটাকে রাজকন্যার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে শুনতে পেলেন, রাজকন্যা বলছে—বাপি, আমাকে ক্ষমা কোরো! অপরাধ নিয়ো না! তুমিতো রাজ্যের সকলকে স্বয়ংবর সভায় ডাক নি! শুধু রাজা আর রাজপুত্রদের নিয়ে পৃথিবী নয় যে, বাপি!

রাজা চমকে উঠলেন।—তুই কাদের কথা বলছিস, মা ?

রাজ্যের যারা সাধারণ মানুষ! যাদের জন্যে—কিছু মনে কোরো না, বাপি, যাদের জন্যেই তুমি রাজা! যারা হাল ঠেলে, চাষ করে,

মাঠে-মাঠে সোনা ফলায়। যারা কাজ করে তোমার রাজত্বকে ধন-ধান্যে ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিচ্ছে; যারা তোমার দেশকে রক্ষা করছে। তাদের জন্যেই তো এ-রাজ্যে লক্ষ্মী বাঁধা। সুবর্ণদ্বীপ যাদের—তারাই বাদ?

রাজার মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে শক্ত হতে লাগল মুখের চামড়া, চোখের চাউনি। রাজা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁকে এখন দেখলে কে বলবে যে তিনি ভালমানুষ, দেবতার মতন রাজা—!

চোখ পাকিয়ে তিনি মনে মনে বললেন, তাহলে গুপ্তচরেরা যে খবর দিয়েছিল—তা সত্যি! গত বর্ষায় উত্তাল হিরণ্যরেখা নদীতে নৌকো বাইচের প্রতিযোগিতায় যে চাষীর ছেলেটা সকলকে হারিয়ে দিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল, রাজকন্যা মণিদীপা তার জন্যেই এত কাণ্ড করেছে! কি যেন নাম ছেলেটার? গণ—গণ—গণদেব! রাজা দাঁতে দাঁত দিয়ে পিষে ফেলে দিতে লাগলেন। রাগে দুঃখে ক্ষোভে অপমানে পাগলের মতন হতে-হতেও সামলে নিয়ে বললেন তো তাহলে তুই কি করতে বলিস মা? কি হলে খুশি হোস্ বল্?

রাজকন্যা চুপ করে থাকল।

—বল মা বল? লজ্জা করিস নি! তোর জন্যে আমি কি না করতে পারি!

রাজা, রাজপুত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের আদর করে ডেকে এক জায়গায় বসিয়ে স্বয়ংবর সভা করলে খুব খুশি হই! রাজকন্যা নরম সুরে বলল।

কিন্তু মা, মনে কর একজন ক্ষেতমজুরের গলায় তুই খেয়ালের মাথায় মালা দিয়ে বসলি। তখন কি কাণ্ডটা হবে ভাব! সেই মজুরটি কি তোকে ঘরে নিয়ে যেতে সাহস করবে? কেমন করে রাখবে তোকে। ভরণপোষণ, প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণই বা করবে কি করে? সুখী করবেই বা কি করে? রাজা বললেন।

সে সাহস তো আমরাই দিইনি তাদের! এটাই তো মানুষের অপমান বাপি, তোমার রাজ্যের মানুষের অপমান মানে তোমারই অপমান! প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকবে! নিশ্বেস নেবার জন্যে বাতাস কি রাজা রাজপুত্রদের জন্যে বেশি আর আলাদা? সূর্যের আলো কি আমাদের জন্যে বেশি আর আলাদা? সূর্যের আলোয় স্নান করার মতন পৃথিবীর সব সম্পদে সকলের সমান অধিকারই তো মানুষের সবচেয়ে সম্মান যে সে ব্যবস্থায় বাধা দেবে, সেই মনুষ্যত্বের অপমানের জন্য দায়ী বাপি!

মনে কর কোন ক্ষেত-মজুরের বা পদাতিক সৈন্যের গলায় তুই মালা দিলি, আর সে তোকে গ্রহণ করতে সাহস করল না, নিল না! তখন?

সেটা আমার অপমান! যেখানে আমার সম্মান থাকবে না সেখানে মালা দেব না। আগে মতামত জেনে নিয়ে তবেই মালা দেব!

কিন্তু তখন যদি রাজা-রাজপুত্ররা তা মেনে না নেয়? যদি রুখে দাঁড়ায়—যুদ্ধ বাধায়?

সেটা সামলাবার ভার তোমাকেই নিতে হবে বাপি! রাজকন্যা হাসল।

রাজা মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। রেগে একেবারে টং হয়ে গেলেন।

তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। দাঁত কিড়মিড় করছে। মনে মনে বলছেন—আমি সমস্ত পৃথিবীর রাজা আর আমার মেয়েকে নেবে একজন সাধারণ মানুষ! এত বড় অপমান! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি! উড়কুড় উঠিয়ে দেব দেশে! আগুন জ্বালিয়ে রাজ্যকে ছারে-খারে দিয়ে চলে যাব, সেও ভাল। কিন্তু কিছুতেই নয়—কিছুতেই নয়—কিছুতেই! মনে মনে এ সব বললেও, মুখে বললেন—বেশ মা, তাই হবে! তুই ওঠ্। তোর জন্যেই তো আমার সব! তুই আমার

আনন্দ-লক্ষ্মী! তুই খুশি থাকলে তবেই আমার রাজ্যের মঙ্গল! ওঠ, লক্ষ্মী সোনা মেয়েটি আমার!

রাজা আদর করে মত দিতেই রাজকন্যার মুখের মুক্তো হীরে ঝলমল করে উঠল হাসিতে। অন্ধকার ঘরে আপনিই যেন জ্বলে উঠল আলো।

রাজকন্যা উঠল। রাজা তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে সোজা ঘরের বাইরে দাঁড়ালেন।

রাজবাড়িতে সর্বত্র হইহই রইরই পড়ে গেল। বইল আনন্দের বন্যা। ফুটল হাসির ফোয়ারা। তিনদিন ধরে চলল খাওয়াদাওয়ার উৎসব। দু'দিনের উপোস উসুল করে নিতে লাগল সবাই।

আর এক গণ্ডা মোণ্ডা, নাও—নাও। দই ক্ষীর আর এক ভাঁড় খাও—খাও? ননীর পিঠে? দাও—দাও! এক কুড়ি আঙুর চাও—চাও!—

শুধু এই সব কথা শোনা যেতে লাগল রাজবাড়িতে। রাজা কিন্তু গোসাঘর থেকে বেরিয়ে মনে মনে ফুঁসতে ফুঁসতে সোজা রাজসভার পেছনের গোপন মন্ত্রণা ঘরে গিয়ে অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করে প্রথমে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিলেন। তারপর হাঁক পাড়লেন, ডাক ছাড়লেন—

—রক্ষী!

রক্ষী এসে মাথা নোয়াল—আদেশ করুন মহারাজ! ডাকো তুই রাজকুমারকে! আর কেউ আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল মকরকুমার আর কুবেরজিৎ।

রাজা বললেন, বোস।

ওরা বসল রাজার সামনে।

—শোন, আমি মরে গেলে তোমরা দু'জনে আর মণিদীপা এই বিশাল রাজ্যকে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে রাজত্ব করবে তো? রাজ্যের আরো উন্নতি ঘটাবে তো? মিলেমিশে থাকবে তো?

মকরকুমার -আপনি যেমন বলবেন—যেমন ইচ্ছে করবেন, তাই করব আমরা!

কুবেরজিৎ-—আপনার সুনাম রাখব আমরা!

রাজা বললেন—নাঃ! তা তোমরা পারবে না—আমি জেনে গিয়েছি।

—কেন মহারাজ?—রাজকুমাররা একসঙ্গে বলে উঠল—

—আমরা কি অযোগ্য?

—তাওনা।

—তবে?

—এ রাজ্যই থাকবে না। হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি থাকতে থাকতেই হবে! তোমরা যদি বেঁচে থাক তো সাধারণ সৈনিক হয়ে বেঁচে থাকবে কিংবা ভিখিরী হয়ে। মকরকুমাব আর কুবেরজিৎ ফণা তোলা সাপের মতন দাঁড়িয়ে উঠল—একি আপনার অভিশাপ, পিতা?

—এ আমি দেখতে পাচ্ছি! তোমবা যদি এক্ষুনি সাবধান না হও, রাজত্ব রক্ষায় প্রাণপণ না কর, তাহলে ঐ রকমই হবে!

মকরকুমার—জীবনপণ!

কুবেরজিৎ—সর্বস্বপণ!

দুজনে একসঙ্গে বলল—বলুন কি করতে হবে? কি করলে আমাদের সেই ভীষণ দুর্দশায় পড়তে হবে না। রাজ্য রক্ষা পাবে! আপনার নাম যশ অক্ষয় হবে?

রাজা হাত তুলে বললেন—তোমাদের প্রতিজ্ঞায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি! এখন শোন। তোমরা কি জান, রাজকন্যা স্বয়ংবর সভায় কেন কারুর গলায় মালা দেয় নি?

—ওর কাউকেই পছন্দ হয় নি বলে!—ওরা বলল।

—গর্দভ!—রাজা বললেন,—এই বুদ্ধি নিয়ে রাজত্ব করবে?

ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রাজা বললেন—ও রাজপুত্রদের গলায় মালা দেবে না! সাধারণ ক্ষেত-মজুরকেই বিয়ে করবে।

মকরকুমার—কি--কি বললেন? তা কি করে হয়? রাজবংশের মান-সম্মান ওকি ধুলোয় লুটিয়ে দেবে, কাদায় ডোবাবে, জলে ভাসাবে?

কুবেরজিৎ—এ চলবে না! চলতে দেব না! রুখব! শক্তি প্রয়োগ করব! ধ্বংস করে দেব!

মকরকুমার—মণিদীপার ইচ্ছাটাই সর্বনেশে! ওটাকেই আগে নষ্ট করতে হবে!

রাজা বললেন—মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। ইচ্ছাটাকে পাল্টানো যাবে ধীরে ধীরে। আগে যার জন্য ওর ইচ্ছে হয়েছে সেটাকে নির্মূল করতে হবে। মানুষের মনে তো ফাঁক থাকে না! যখন সামনে কিছু থাকবে না, তখন নতুন ইচ্ছে তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে! মানুষের মনটা হচ্ছে ইচ্ছের যন্ত্র। সব সময় সেই যন্ত্রে নতুন নতুন ইচ্ছে তৈরি হতে পারে, বুঝলে?

মকরকুমার—কিন্তু. সাধারণ মানুষ তো একজন নয়, রাজ্যের শত-করা নিরানব্বই জনই তো সাধারণ চাষী আর ক্ষেত-মজুর! সব্বাইকে নির্মূল করে দিলে রাজ্য চলবে কি করে—?

—ঠিক ধরেছ! মাথাটাকে খুঁজে বার করতে হবে! তারপর সেটিকে অকেজো. পাগল করে দিতে হবে!

—কে সেই সাধারণ মানুষের মাথা? কুবেরজিৎ বলল, বলুন, এখুনি কেটে বর্শায় গেঁথে ফুলের তোড়ার মত উপহার দেব আপনাকে! বামন হয়ে চাঁদে হাত।

ওরা দুজনেই খাপ্ থেকে একটু খুলে তুলে ধরল নিজের-নিজের তলোয়ার। তলোয়ার থেকে আলো ছিটকে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল।

—অত সহজ নয়! শোন, খুব বুদ্ধি করে এগুতে হবে! তোমরা দুজন, প্রধানমন্ত্রী আর প্রধান সেনাপতি ছাড়া কেউ যেন না জানতে পারে। আরো কাদের সাহায্য চাই বলবে!

—একদল বিশ্বস্ত সৈন্য আর আমাদের দেহরক্ষীদের নিলেই হবে। আমরা দুজনেই পারি। তবে আপনি তো তা করতে দেবেন না! মকরকুমার বলল।

—এবার বলুন, বাবামশায় কে সে? কুবেরজিৎ জানতে চাইল।

—তোমরা কিছুই আঁচ করতে পারছ না? রাজা বললেন—নাঃ, তোমাদের মাথায় দেখছি, বুদ্ধির কুঁড়িই ধরে নি এখনো! গত বর্ষা-উৎসবে হিরণ্যরেখা নদীতে নৌকো-প্রতিযোগিতার কথা মনে আছে?

কুবেরজিৎ—মনে বিঁধে আছে।

মকরকুমার—কাঁটার মতন খচ্‌খচ্‌ করছে দিনরাত!

রাজা—যার জন্যে অমনটা হয়েছে তার কথা মনে কর!

কুবেরজিৎ—ওঃ! বুঝেছি! সেই যে যার সঙ্গে আমরা কেউ পারলাম না! কি যেন নাম!

মকরকুমার—হ্যাঁ, হ্যাঁ! গো-হারান হারলাম! অপমানটাকে গলার হার করে পরে আছি সেদিন থেকে! সে কি ভুলি!

কুবেরজিৎ—নামটা!—গণ—!

রাজা—কিছুই মনে নেই! গণদেব!

—এইবার সুযোগ পেয়েছি! দেখে নেব! দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে তলোয়ারের ঝনঝনি তুলে বলল মকরকুমার!

—নৌকো চালানো আর তলোয়ার চালানো যে এক ব্যাপার নয়, বুঝিয়ে দেব বলল, কুবেরজিৎ।

—দাঁড়াও! দাঁড়াও! বড্ড যে উৎসাহ দেখছি! কিচ্ছু বোঝ না! কি আর বলব! গোপাল ছেলে সব! গরুচরানো ছাড়া কিছুই করার যোগ্য নও! রাজপুত্র না রাজহংস তোমরা! খালি গ্যাঁক-গ্যাঁক করে ডাক ছাড়তেই জান, আর ভাবভঙ্গী কর!—

রাজপুত্ররা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। রাজা আবার বললেন—শোন, এইমাত্র ঠিক করলুম প্রধানমন্ত্রীর বা প্রধান সেনা-পতিরও জানার দরকার নেই। যে সব রাজা আর রাজপুত্রদের

স্বয়ংবর সভায় নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, তাদের মৃগয়ার উৎসবে ডাক। শিকারে বেরুবার আগে তাদের আলাদা আলাদা করে বুঝিয়ে দাও যে, ঐ গণদেবের জন্যেই রাজকন্যা তাঁকে বরণ করল না—প্রত্যেককে বল। হিংসা জাগাও! বিদ্বেষ জাগাও! তারপর তাদের নিয়ে যাও হিরণ্যরেখার তীরে বাসমতী গ্রামের পাশে। সেখানে শিবির ফেল। আর শোন বাসমতী অঞ্চলের জমিদার সামন্ত সিংকে দলে ভিড়িয়ে নাও। তারপর—! রাজা একটু পায়চারি করে নিয়ে আবার বললেন —তারপর. ঐ রাজপুত্র বাহিনী গ্রামে একটু-আধটু অত্যাচার চালালেই গণদেব এগিয়ে আসবে, ফাঁদে পা দেবে, প্রতিকার চাইবে! তখন তাকে আটক করে লুকিয়ে রাখ! খাঁচার পাখি করে রাখ! না, হত্যা কোরো না। সময় সুযোগ মত তাকে অন্য মানুষ করে ফেল। ধনী করে দাও! যেন তোমাদের শেখানো বুলিই তার বুলি হয়, তোমাদের মতই তার মন হয় সেই ব্যবস্থা কর। পাঁচ বছর কয়েদ খাটলেই মানুষ পাল্টে যায়। তার ওপর আসল সময়টা যায় চলে, বুঝলে। রাজপুত্রদের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওরা কি যেন বলতে গেল। রাজা হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন, যতদিন তা না পারবে, ততদিন—মকর-কুমার—তোমাকে মূর্খকুমার বলে ডাকব—আর কুবেরজিৎ, তোমাকে ডাকব কুমড়োজিৎ বলে—মনে থাকে যেন! রাজার বলার ধরন-ধারণ দেখে রাজকুমাররা ফিক্-ফিক্ করে হেসে ফেলল। তারা ওঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, পিতৃদেব আপনার পরামর্শ শিরোধার্য। আপনি সত্যিই সসাগরা পৃথিবীর রাজাধিরাজ হবার যোগ্য। আপনাকে পিতা রূপে পেয়ে আমরা ধন্য!

দুই

পরদিন রাজবাড়ির প্রভাতী বাজনা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর করে সাজানো একশো তেজী ঘোড়ায় চড়ে একশো দূত উত্তরে-দক্ষিণে, পুবে-পশ্চিমে, ঈশান-নৈঋ‍র্তি, অগ্নি-বায়ু বিভিন্ন দিকে ছুটল টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌, খটাখট্‌ খটাখট্‌ করে। ঝমঝম, ঝমঝম, টুংটাং, টুংটাং ঘোড়ার গায়ের গহনার শব্দে দিগবিদিক ভরে গেল। রাজ্যের সাধারণ মানুষ ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় দৌড়ে এসে দেখতে লাগল। লোকে ভাবল হঠাৎ এত ঘটা করে ঘোড়ার শোভাযাত্রা কেন? ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? দুচারজন বলাবলি করল রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, আমরা আর কি জানি বল? রাজনীতিটা সাধারণ মানুষের কাছে না জানা বিদেশী ভাষার মতন, ধাঁধার মতন, আকাশের রহস্যের মতন। তারা ঠোঁট উল্টে, হাত উল্টে বলে, কে জানে বাবা, আবার কি মচ্ছব লাগল!

ছেলেমেয়েরা আনন্দে হৈহৈ করে ঘোড়সওয়ারদের দৌড় দেখতে লাগল। তা দেখে বুড়োদের মধ্যে কেউ কেউ ঘাড় নেড়ে বলল—মজা দেখছ, দেখ! আজ যেটা মজা, কাল সেটা মজা টের পাওয়া না হয়ে দাঁড়ায়!

স্বয়ংবর সভায় যে সব রাজা আর রাজপুত্ররা এসেছিলেন, তাঁদের কাছে দূত গিয়ে সুবর্ণদ্বীপের রাজাধিরাজের নেমন্তন্নের চিঠি দিল। মৃগয়া উৎসবের নেমন্তন্ন। তারপরে আবার নতুন করে স্বয়ংবর সভা হবে তার আভাস রইল। রইল আশ্বাস।

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত চলবে হরিণ শিকার হিরণ্যরেখা নদীর ধারে, ভয়ংকর কালভৈরব জঙ্গলের ঠিক বাইরে, দেওদার গ্রামে পড়বে উৎসব-শিবির। রাজকীয় সব ব্যবস্থা থাকবে। খাওয়াদাওয়া, খেলাধূলা, আনন্দ-উৎসব—তার উপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা। মেলা বসবে গ্রামের ধারেই। লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া, দোকান-

পসার আগে থেকেই গিয়ে হাজির সেখানে। হিরণ্যরেখা নদীর বাঁধের রাস্তায় লোক চলাচলের আর বিরাম নেই -- দিনরাত মিছিলের মত মানুষের চলাচল, চলছে—তো চলছেই! একদল যাচ্ছে—একদল আসছে, পিঁপড়ের সারের মত! আলোয় ছেয়ে গেছে নদীর ধার আর আসপাশটা। যেন হাজার হাজার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ হচ্ছে, আর লক্ষ-লক্ষ যাত্রা-গানের আসর বসতে চলেছে গ্রামে।

কয়েকদিনের মধ্যেই জমজমাট হয়ে উঠল জায়গাটা। বড় বড় শিবির ছাউনি পড়ল। মখমলে ঢাকা তার ভেতর। আতর আর গোলাপ জলের গন্ধে ভুরভুরে বাতাস বইতে লাগল। দিগ্‌বিদিকের রাজা আর রাজপুত্ররা এসে গেলেন একে একে, কেউ কেউ দল বেঁধে। সুবর্ণদ্বীপের রাজা ধনপতি রাজপুত্র মকরকুমার আর কুবেরজিৎকে পাঠিয়েছেন ঐ সব রাজা আর রাজপুত্রদের আদর-যত্ন, দেখাশোনা করতে। বিরাট সৈন্যদল নিয়ে হাতিতে চড়ে এগিয়ে গিয়ে অতিথিদের

অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছেন শিবিরে শিবিরে। আরাম আর আনন্দের ব্যবস্থা দেখে অতিথিরা খুব খুশি। শুক্লপক্ষের শুরু থেকে মৃগয়া চলবে দিনরাত।

অমাবস্যার দিনে সবাই এসে পৌঁছে গেলেন। সেদিন রাতে বিরাট এক পানভোজনের আয়োজন হয়েছে। আনন্দ-উৎসব, নাচ-গান—নাটক। তার আগে মকরকুমার আর কুবেরজিৎ অতিথিদের সঙ্গে এক গোপন সভায় বসতে চাইলেন। কেমন করে মৃগয়ায় যেতে হবে, কালভৈরব জঙ্গলের পরিচয়, কত রকমের ভীষণ ভীষণ জন্তু থাকে ঐ জঙ্গলে,—কি কি বিষয়ে সাবধান হতে হবে। জঙ্গলে চোরাবালি আছে, রক্তচোষা মাছি আছে, রক্তচোষা গাছ আছে, অজগর সাপ আছে। গাছে গাছে সাপ ঝোলে সেখানে। কোন্ জায়গাটায় কি ভাবে চলতে হবে--এই সব ব্যাপারে সবাইকে সবকিছু জানিয়ে দেবার জন্যই ঐ সভা। সভায় শুধুমাত্র রাজা ও রাজপুত্ররা থাকবেন, বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না।

সন্ধ্যেবেলায় মূল শিবিরে বসল সেই গোপন সভা। প্রহরীরা-খোলা তরোয়াল আর বল্লম উঁচিয়ে পাহারা দিতে লাগল শিবিরের বাইরেটা, কেউ ঢুকতে পেল না। এমন কি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এক বিশেষ দূত এসেও অপেক্ষা করতে লাগল।

কুবেরজিৎ রাজপুত্রদের বুঝিয়ে বলল, কেন রাজকন্যা মণিদীপা কন্দর্পকান্তি সব রাজা আর রাজপুত্রদের কাউকেই পছন্দ করে নি, মালা দেয় নি।

সে বলল, বন্ধুগণ! আপনাদের সামনে, দুনিয়ার সমস্ত রাজা আর রাজপুত্রদের, রাজবংশের সামনে আজ এক অশুভ দিন এসে গেছে। আমরা যদি রাজবংশের মর্যাদা এমনি করে হাতছাড়া হতে দিই, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের সব্বাইকে অনাহারে ধুঁকতে ধুঁকতে অসহায়ভাবে মরতে হবে। নিজের হাতে জমি চাষ করে, নৌকো চালিয়ে, ধান চাল বিক্রি করে নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আনন্দ-উৎসব ছেড়ে, আরাম-বিশ্রাম ছেড়ে, সুখ-শান্তি ছেড়ে ভিখারী হতে হবে। পৃথিবীতে সেই দুর্দিনে তাদের রাজারা ছাড়া আর কোন রাজাই থাকবে না! সেই ভয়ংকর দিনে অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যারা

সম্পূর্ণ আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে যাবে। সেই ভয়ংকর দিন যাতে না আসে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটা রয়েছে আমাদেরই হাতে। যদি আপনারা রাজা হয়ে ধনে-ঐশ্বর্যে, সুখ-সমৃদ্ধিতে, ক্ষমতায় বাঁচার মতন বাঁচতে চান তো বলুন! তার আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, সেই অধিকার রক্ষা করার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে রাজী আছেন সবাই। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যা মণিদীপার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপ রাজ্যের তিনভাগের এক ভাগ পাবার যোগ্যতা আপনাদের সকলেরই আছে। আর সেই জন্যই আবার আপনাদের সসম্মানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি। এর আগের বারে আপনাদের যে অমর্যাদা হয়েছে, তা আমাদেরও অমর্যাদা। সেটি আর হতে দেব না, পণ করেছি। এখন বলুন, রাজী?

শুনে রাজা আর রাজকুমারদের চোখগুলো আশা আর উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠল। লোভের আর প্রতিহিংসার আগুন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ থেকে। তারা এক সঙ্গে বলে উঠল আমাদের মর্যাদা আর অধিকার রক্ষার জন্যে সমস্ত পণ করলাম। এখন বলুন, কি করতে হবে? আমাদের পথের কাঁটা হয়ে যে বা যারা দাঁড়াবে, তাদের ছারখার করে দেব! তারা চাপা গলায় সবাই মিলে ধ্বনি তুলল—তুনিয়ার রাজা আর রাজপুত্রেরা সব এক হও!

কুবেরজিৎ বলল—বড় আনন্দ পেলুম আপনাদের মনের কথা শুনে। এবার যুবরাজ মকরকুমার আপনাদের বলবেন, কেমন করে কি করতে হবে। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। চচ্চড় চড়াচ্চড় হাততালি পড়ল। মনে হল যেন ফট্‌ফট ফটাফট করে হাজারখানেক পায়রাকে উড়িয়ে দিল কারা।

মকরকুমার ঠোঁট পেঁচিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল—মহামান্য রাজন্যবর্গ ও রাজকুমারগণ! আপনাদের সামনেই একটি করে কাগজের বন্ধ শিলমোহর করা পেটিকা রয়েছে। ওর মধ্যেই আমাদের পরিকল্পনার কথা লেখা আছে। সকলের সামনে চীৎকার করে সে-সব কথা বলা

ঠিক হবে না। কারণ আপনারা জানেন যে, শিবিরের পর্দারও কান আছে। কে কোথায় শুনে ফেলবে ঠিক কি? শুধু একটি কথা বলব—এই দেওদার গ্রামের পরেই দশ ক্রোশ জুড়ে কালভৈরবের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ওপাশে এই হিরণ্যরেখা নদীর ধারে বাসমতী বলে এক ছবির মতন গ্রাম আছে। সেই গ্রাম সারা বছর সব সময়ে ধানের গন্ধে ম-ম করে। সেই গ্রামের কথা আপনারা অনেকেই জানেন!

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, গত বর্ষা-উৎসবে নৌকো চালানো প্রতিযোগিতায় সেই গ্রামের এক চাষী ছেলের কাছে আমরা সবাই পরাজিত হয়েছিলাম। আমাদের অতি আদরের বোন রাজকন্যা মণিদীপা সেই চাষীর ছেলের নৌকো চালানো দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের গলার মহামূল্য গজমতির হার খুলে তাকে পুরস্কার দিয়েছিল। সেই গণদেব ঐ গ্রামের শুধু নয়, সারা রাজ্যের চাষী সমাজের নেতা। সে কথা থাক—বলছিলাম কি, এই মৃগয়াটা সাধারণ মৃগয়া নয়, আমাদের রাজকীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিলাস—আমাদের মর্যাদা রক্ষার মৃগয়া এটা। এটা সুখ-সমৃদ্ধি-মর্যাদা সম্মানের পথের কাঁটা তুলে ফেলার অভিযান। আপনারা শুধু হরিণ শিকারই করবেন না, সিংহ শিকারও করবেন—বাধার সিংহ। নিরীহ সুখী প্রাণীদের মুক্ত মেলা করে তুলতে হবে এই বনকে। ঐ মোড়কে এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছে—“নিষ্কণ্টক অভিযান।” এই কথাগুলো মনে রেখে ওটা পড়ে দেখুন। তারপর বেশ সাবধানে ওটাকে রেখে দেবেন, কিংবা পুড়িয়ে ফেলবেন। দেখবেন, যেন আপনাদের অতি বিশ্বস্ত অনুচররাও ওটাকে দেখতে না পায়।

রাজারা আর রাজকুমাররা পেটিকা খুলে নিশ্বেস বন্ধ করে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে তাদের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে গর্জন করে উঠল সবাই—ভুলিনি! অপমানে জ্বলে যাচ্ছি! হিংসেয় পুড়ছি! এখন বুঝছি রাজকন্যা স্বয়ংবর সভায় কেন আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে চলে গেলেন।

এত বড় স্পর্ধা! বামন হয়ে চাঁদে হাত! প্রতিহিংসা মেটাতে চাই! প্রতিশোধ নিতে চাই! কালভৈরবের আসল বাঘকে মারাই এই শিকার উৎসবের একমাত্র লক্ষ্য! কাঁটা তুলবই। সুখে, আরামে, বিলাসে সাঁতার দিতে দিতে রাজত্ব করব। পৃথিবীটা আমাদের রাজাদের। জয় ধনপতি রাজার জয়! ধনপতি রাজার জয়, আমাদের জয়!—

তারপর শুরু হল খাওয়াদাওয়া, নাচগান—আমোদ আর হল্লা। কালিয়া, পোলাও, ক্ষীর দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রাজভোগ, ক্ষীরমোহন সব উপচে পড়তে লাগল—গড়াগড়ি যেতে লাগল; ছোঁড়াছুঁড়ি হতে লাগল। আঙুরের তৈরি সোমরসে ভর্তি সোনার কলসীগুলো উপুড় করে দিল সবাই আনন্দে। জলের মতন আঙুরের রস গড়িয়ে যেতে লাগল। নর্দমা দিয়ে খাবার-দাবারের সঙ্গে গড়িয়ে পড়ল। খাওয়া-দাওয়ার শেষে নেশায় ঝোঁকে রাজপুত্ররা এক নতুন খেলায় মাতল। রাজভোগগুলোকে নিয়ে বল খেলতে লাগল তারা। আঙুরের রস আর দই ক্ষীর নিয়ে দোল খেলতে লাগল। হৈহুল্লোড় ধাক্কাধাক্কিতে সবগুলো আলো গেল নিবে। তখন চলল অন্ধকারের মধ্যে দোল খেলা।

নাচগান, হাসি-হল্লার শব্দে জঙ্গলের জন্তুরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। এইভাবে তারা মণ মণ ভাল-ভাল খাবার দাবার নষ্ট করল সারারাত ধরে। আর ঠিক তার কিছুক্ষণ আগে পাশের দেওদার গ্রামের কিংবা দূরের বাসমতী গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো সামান্য শাক-সব্জি দিয়ে ডাল-ভাত খেয়ে ঘুমুতে গেছে। অনেক ক্ষেত-মজুরের তাও জোটেনি। কিন্তু অনেক দূর থেকে শুনেছে তারা নাচগান বাজনার আওয়াজ আর হুলাহুলির শব্দ। বুঝেছে শিবিরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। গ্রামের তরুণরা ভেবেছে কেন এমন হবে? বৃদ্ধরা নিশ্বেস ফেলেছে, যুবকরা অস্থির হয়ে সারারাত ঘুমুতে পারেনি।

পরের দিন বিশ্রামের দিন। আহা, তা তো হবেই! সারারাত

ধরে আনন্দ করতে গেলে পরিশ্রম হয় না? আনন্দ, আরো আনন্দ, মাতামাতি, আরো মাতামাতি করতে করতে রাজপুত্রদের ননীর শরীরগুলো ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল। যাকে বলে প্রভাতী বাজনা তা বাজল দুপুরবেলায়। ধীরে ধীরে সব রাজকুমাররা চোখ মেললেন। চাকর-বাকর, দাসদাসীরা তটস্থ হয়ে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল। গোলাপ জলে মুখ ধুয়ে তারা প্রথমেই আঙুরের সরবৎ খেলেন একপাত্র করে। তারপরে বলবান পরিচারকরা তাঁদের সুগন্ধী তেল মাখাতে লাগল একঘন্টা ধরে। তারপর রুপোর বাঁকানো জলাধার থেকে জুঁইফুলের নির্যাস মেশানো ঠাণ্ডা জলে ওঁদের চান করিয়ে দেয়া হল। ক্লান্তি চলে গেল। ধনপতি রাজার সেবাযত্নের ব্যবস্থায় ওঁরা খুব খুশী। স্নানের পর প্রসাধন। তারপরে আবার খাওয়াদাওয়া। খাওয়াদাওয়ার পরেই সুন্দর বাজনা শুনতে শুনতে ফুল ছড়ানো পালকের বিছানায় গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল সবাই। কি আরাম!—

সেই কথায় আছে না, 'রাজা-রাজড়ায় যুদ্ধ হয় আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।' কথাটা শুনেছ তোমরা? কথাটার মানে জান? এর ওপরের মানেটা হচ্ছে—রাজারা যখন বিরাট সৈন্যদল হাতি-ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করে, তখন পথে, মাঠে, ময়দানে যেখানে লম্বা ঘাসের মতন উলুখাগড়ার বন আছে, সেগুলো হাতি-ঘোড়া সৈন্যদের পায়ের চাপে, যুদ্ধের দাপটে পিষে দলে, ছিঁড়ে-ছুঁড়ে, মরে-হেজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবার অন্য মানেটা খোঁজো। সেটাই আসল মানে, ভেতরের মানে। সেটা কি? রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ বাধে, যখন রাজারা অভিযানের নেশায় বিলাসে মত্ত হন তখন মরে সাধারণ মানুষগুলো। গ্রামের শহরের সাধারণ মানুষগুলো যারা যুদ্ধ করছে না, তাদের দুঃখ-দুর্দশার আর সীমা থাকে না। অভাবে, অনাহারে, রোগে, শোকে অসহায় ভাবে তারাও মরে। নানান দুর্নীতি অন্যায় অভাব আর অত্যাচারের শিকার হয় সাধারণ মানুষ। তাছাড়া যারা যুদ্ধ করে মরে সেই

সৈন্যরাও তো সাধারণ মানুষ। আর তাদের কষ্ট, ত্যাগ, পরিশ্রম দিয়ে, এমন কি জীবন দিয়ে যে ফসল ফলার তারা, যে শিল্প, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে তারা, সেগুলো ভোগ করে কিন্তু ঐ রাজা-রাজড়ারা।

সুবর্ণদ্বীপেও সেই ব্যবস্থাই চলছিল। অবশ্য ঠিক এই ধরনের ঘটনা আগে কোনদিন ঘটেনি সেখানে। অন্য রাজ্যের মত এখানকার গরিব সাধারণ মানুষেরা মনে করে ভাগ্য তাদের এমন করছে। ভগবান তাদের এমনি ভাবেই বাঁচার ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছেন। তাদের পূর্বজন্মের পাপের জন্য, কর্মের জন্য, তারা নাকি এই রকমের জীবন পেয়েছে। দুঃখের, অভাবের, উপবাসের, দাসত্বের, অপমানের অসহায় জীবন। এটা কর্মফল। আর ওদিকে রাজার রাজপুত্ররা ভাবে ভগবান তাদের রাজ্য, ঐশ্বর্য, সুখ-সমৃদ্ধি, বিলাস ভোগ করার ভাগ্য কপালে লিখে পাঠিয়েছেন। যা খুশী করার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তারা সারা জীবন সুখের নদীতে সাঁতার দেবার জন্যেই জন্মেছে। দুঃখ কষ্ট এই সব ছাড়া, তারা সবকিছু ভাল সবচেয়ে বেশি পাবে। কোনো কাজ করবে না, শুধু হুকুম করবে। দরকার হলে তলোয়ার চালাবে নিরীহ লোকের ওপর। শক্ত লোককে দলবল দিয়ে মারবে : সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি গুণ বা প্রতিভা বা শক্তি দেখলে তারা রেগে আগুন হয়ে উঠবে। হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাবে। কারুর স্বাধীন মনোভাব, ন্যায় নীতি বোধ, অধিকার বোধকে তারা কিছুতেই সহ্য করবে না। ঐ রেগে আগুন হওয়াটাই একমাত্র গুণ তাদের। এই ভাবেই পৃথিবীটা চলছিল বেশ। সুবর্ণদ্বীপের মানুষগুলোও যেন ঐ থেকেই মেনে নিয়েছিল এতদিন। কিন্তু হঠাৎ যেন কোথায় একটা খটকা লাগল সাধারণ মানুষের মনে। বর্ষা-উৎসবে যখন বাসমতী গ্রামের চাষীর ছেলে মাঝি গণদেব নৌকো চালানোয় প্রথম হল তখন থেকে। রাজা এবং রাজপুত্রদের মুখ কালি হয়ে গেল। পুরস্কার দেওয়ার সময় তারা কেউ থাকল না।

শুধু মাত্র রাজকন্যা মণিদীপা হাততালি দিয়ে সম্মান জানিয়েছিল। খুশী হয়ে নিজের গলার গজমতির হারাটাই খুলে নিয়ে পুরস্কার দিয়েছিল। এ সব কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে দেশের মানুষের। মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে। রাজ্য তো সকলের। নিরপেক্ষ বিচার হবে তো তাঁর। আর রাজা এমনিতে তো খারাপ নন, ভালই। তবে নিজের সব স্বার্থ বজায় থাকলে তবেই তিনি ভাল, সব মনের মত হলে তবেই উদার! সাধারণ মানুষের মনে এইসব চিন্তা মশার মতো গুন্‌গুন্‌ করতে লাগল। রাজপুত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গণদেব জিতেছে। দেশের মানুষ তা দেখে আনন্দে ফেটে পড়েছে। জয়ধ্বনি করছে গণদেবের। মাতাল হয়ে গেছে যেন সবাই। চাষী মজুর মাঝিদের মুখ উজ্জ্বল করেছে গণদেব। কিন্তু সাধারণ মানুষের ঐ আনন্দে রাজার কেন মুখ শুকিয়ে যায়? পুরস্কার বিতরণীর আনন্দমেলায় রাজা কেন থাকেন না? এই সমস্ত দারুণ জিজ্ঞাসা সাধারণ মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। তার ওপর—বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতন, কিংবা মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতন এলো রাজকুমারদের শিকার অভিযান। সহ্যের সীমা ছড়িয়ে যেতে চাইল।

সারাদিন বিশ্রামের পর অমাবস্যার দিন বিকেলবেলা থেকে শুরু হল রাজা-রাজপুত্রদের মৃগয়া। সে এক মহাধুমধামের ব্যাপার। হরিণ মারার জন্যে বিরাট আয়োজন; যেন মশা মারতে কামান দাগার। ব্যাপার। দুপুরবেলায় এলাহি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সোনার থালায় সোনারঙের পোলাও। কিশমিশ বাদাম পেস্তা আখরোট আর গাওয়া ঘি থকথক করছে। সোনার বাটিতে বড়-বড় রুই মাছের মাথার কালিয়া। হরিণের মাংসের এখন যাকে বলে কোপ্তা, তাই। তার ওপরে দই ক্ষীর পায়েস আর একুশ রকমের মিষ্টি! ওরা অল্পস্বল্প মুখে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে থালাবাটিগুলোকে ঠেলে

ঠেলে উঠে গেলেন। তারপরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম বিকেলে আরো একপ্রস্থ ফলমূল খাওয়ার পর সাজো-সাজো রব উঠল। শিঙা বেজে উঠল পোঁ-ওঁ-ওঁ—পোঁ-ওঁ-ওঁ !

হাতি, ঘোড়ার ডাক শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে। হাজার হাজার মানুষের ব্যস্তভাবে তৈরি হওয়ার ছুটোপাটি লেগে গেল।

হাজার রাজপুত্ররা প্রথমে পা থেকে গলা পর্যন্ত সূক্ষ্ম জালের তৈরি বর্ম পরল। আহা, ননীর শরীরে যদি আঁচড়-ফাঁচর লেগে যায়! ওটা থাকলে তীর গায়ে বিঁধবে না, তরোয়ালেও কাটবে না, বাঘের আঁচড় লাগবে না।—তার ওপরে চামড়ার সঙ্গে মখমলের কাজ করা জামা, পাজামা পরল সবাই, তারও ওপরে পালকের মতন হালকা রেশমের জামা পরল। গলায় সোনার জালের গলাবন্ধ। মাথায় হনুমানটুপির মতন সোনা-মোড়া শিরস্ত্রাণ। চোখ দুটিকে খোলা না রাখলে নয়, তাই শুধু সে-দুটিই খোলা রইল সকলের।

এইভাবে জনে-জনে এক-একটা পোশাকের দুর্গের মধ্যে ঢুকে কি করবে? না, হরিণ শিকার! বোঝ একবার! বুঝেছ নিশ্চয়ই, কারণ এ তো আর খুব শক্ত অঙ্ক নয় যে বুঝতে পারবে না! কেউ হাতির হাওদার নরম বিছানায় মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আরাম করে রুপোর গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে, কেউ-বা তেজী ঘোড়ায় চড়ে তীর-ধনুক, তলোয়ার, বল্লম, আর দু-পাশে হাজারখানেক করে সৈন্য নিয়ে কালভৈরবের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

আর হাতি-ঘোড়ার পায়ের চাপে, সৈন্যদের বেপরোয়া চলায় দেওদার গ্রামের পথ-ঘাট, ক্ষেত-খামার সব তছনছ হয়ে যেতে লাগল।

দেওদার গ্রামের লোকেরা প্রথম দিন খুব আগ্রহ নিয়ে দেখল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো সব কিছু ভুলে মৃগয়া অভিযাত্রী বাহিনীর পেছু-পেছু চলল। ধুলোয়-ধুলোয় সারা গ্রামখানা ভরে গেল।

কালভৈরবের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা যেতেই সন্ধ্যে হয়ে এল। মকরকুমার আর কুবেরজিৎ দলবলকে থামিয়ে হাতির ওপর থেকে

ঘোষণা করল—বন্ধুগণ! অজানা জঙ্গলে প্রথম দিনই রাতে থাকাটা ঠিক হবে না। আজ, চলুন ফিরে যাই। কাল ভোরে আবার শিকার শুরু হবে!

কয়েকটা নিরীহ পাখি আর খরগোস শিকার করে মশাল জ্বালিয়ে বিরাট বাহিনী যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছে, এমনি ভাবে গ্রামের মাঝখান দিয়ে ফিরে এল শিঙা বাজাতে বাজাতে।

পরের দিন ভোরবেলায় গ্রামের বড়রা গ্রামের ক্ষেতখামারের অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসল। সবুজ মখমলের মতন চোখ-জুড়োনো ধানের ক্ষেতগুলো হাতি-ঘোড়া আর সৈন্যদলের পায়ের চাপে থেঁত্‌লে গেছে, রবিশস্য ধ্বংস হয়েছে। এ রকম চললে দুর্ভিক্ষ হবে। তারা গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে সব খুলে বলল। মোড়লকে নিয়ে বসল তাদের সভা। সভায় ঠিক হল যে জমিদার রাজা সামন্ত সিং-এর কাছে গিয়ে সব কথা বলতে হবে। গ্রামের লোকেরা মোড়লের সঙ্গে রাজা সামন্ত সিং-এর দরবারে হাজির হল।

ঐ সাত-সকালবেলায় দরবারে সামন্ত সিং হাজির। তাঁকে দেখে মনে হল যে উনি যেন দেওদার গ্রামের লোকদের জন্যেই দরবারে এসে বসে আছেন।

—আসুন, আসুন, মোড়লমশাই! বলুন, কি সংবাদ? মোড়ল-মশাই হাতজোড় করে বললেন—রাজপুত্রদের সখের জ্বালায় আমরা তো ধনে-প্রাণে মারা যেতে বসেছি!

—কেন, কি হল আবার? সামন্ত সিং গোঁফ চুমরে বললেন।

—তা তো হতেই পারে না! রাজপুত্ররা তো তেমন নন্‌!

—এলেবেলে শিকারের নাম করে যদি হাজার হাজার সৈন্য, হাতি, ঘোড়া গ্রামের রাস্তা আর ক্ষেত-খামারের ওপর দিয়ে চলে যায়, তাহলে দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কি বাকি থাকবে বলুন? আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছেন রাজপুত্রেরা। রাজা সামন্ত সিং সকলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকালেন। তারপরে একটু চুপ

করে থেকে বললেন. এ-সম্বন্ধে আমি কি ভাবিনি ভাবছেন ? ভেবেছি, ভেবেছি,—খুব ভাল করেই ভেবেছি। এখন দুটো পথ আমাদের সামনে খোলা আছে। রাজপুত্রেরা আর কদিন শিকার করবেন! ঐ অজুহাতে দেওদার গ্রামের দুবছরের খাজনা মাপ্ করে দেবার কথা বলতে পারি!

—তাতে কি লাভ ? ঐ খাজনার টাকায় ফসল ফিরে পাব ? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো ! একজন চাষী চটে গিয়ে বলল

—আর এক উপায় আছে! ওদের বলতে পারি, জঙ্গলের ধারে গ্রামের পেছনে যে পোড়ো উঁচু-নীচু জমিটা আছে, সেখানে তাঁবু ফেল গিয়ে সেখান থেকে জঙ্গলের ভেতরে ঢোকো আর বেরিয়ে সেখানেই থাকো, তাতে গ্রামটা বাঁচে। কিন্তু মুস্কিল কি জান, ঐ জন্তু-জানোয়ারের পেছনে দৌড়তে ওরা আবার বাসমতী গ্রামটাকে না তছনছ করে তখন তো তোমরাই আবার বাসমতী গ্রামের পক্ষ নিয়ে হৈ-চৈ করবে ?

—সব গ্রামই সমান। ফসলের ক্ষতি মানেই সারা দেশের ক্ষতি! বাসমতী গ্রাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সেখানকার ক্ষতিটাও আমাদের ক্ষতি! আর একজন চাষী বলল।

—এত রাজসূয়, কুরুক্ষেত্র শিকারের দরকার-ই বা কি ? জোর থাকে তো দু-চারজন করো। দেখি সব কতবড় বীরপুরুষ! আর একজন বলল।

সামন্ত সিং মোড়লকে কাছে ডেকে প্রায় চুপি চুপি কি সব পরামর্শ দিলেন।

সমস্ত শুনে মোড়ল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—রাজামশাই চাৎকার করে কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই আমাকে যে কথা বললেন তোমাদের তাই শুনিয়ে দিচ্ছি।

—রাজপুত্রেরা পোড়ো জমিতে চলে যাবেন। কিন্তু বাসমতী গ্রাম নিয়ে মাথা ঘামাক ও গ্রামের লোকেরা। তা নিয়ে আমরা মাথা গরম

করতে যাই কেন ? তাদের গ্রামে তা-বড় তা-বড় লোকের তো আর অভাব নেই। আমাদের যেটুকু ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে দেবেন রাজা, তাছাড়া এ গ্রামের কাউকেই দুবছর কর দিতে হবে না !—কি, তোমরা খুশী তো ?

সবাই বলে উঠল—এখনকার মতন খুশী—।

সামন্ত সিং-এর লোকজন গ্রামের সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে ছাড়ল। গ্রামসুদ্ধ লোক খুশী হয়ে ফিরে চলল। পথে সবাই বলাবলি করতে লাগল যাই-বল বাপু, রাজা সামন্ত সিং যেন সে-মানুষ আর নয় ! খুব ভাল ব্যবহার করেছে

এত ভাল তো জানতুম না।

—শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই !

কথাবার্তার গতি দেখে একজন যুবক বলল—দেখ বাপু, তোমরা যতই আদরে গলে গদগদ হও, জেনে রেখ রাজারা আর জমিদারেরা বিনা কারণে কখনো ভাল ব্যবহার করে না। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। কিছু আদায়ের মতলব। ও জাতই আলাদা। এ সব জমিতে ভাল গাছ হয় না। হলেও লাখে একটা ! তাদের রাজত্ব থাকে না ! তা না হলে তারা সন্ন্যাসী হয় !

এবারে মোড়ল রেগে টং হয়ে বললেন—তোমরা সবটাতেই খারাপ দেখ ! উগ্রমূর্তি ধরো, সন্দেহ কর ! দেখই না, আমরা তো ঘুমিয়ে থাকছি না ! খালি বাঁকা চিন্তা নিয়ে হাঁকাহাঁকি কর ! আরে নিজেদের স্বার্থটা আগে দেখবে তো !

গ্রামের লোক গ্রামে ফিরল। এদিকে আর একদিকের রাস্তা দিয়ে সামন্ত সিং জোর ছুটিয়ে দিলেন তাঁর লাল ঘোড়াকে। ঝড়ের গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন দেওদার গ্রামের মৃগয়া অভিযাত্রী রাজকুমারদের তাঁবুতে। খুব ভাল করে সাজানো একটা তাঁবুর ভেতরে আরাম করে বসে মকরকুমার আর কুবেরজিৎ মন্ত্রণা করছে, শলা-পরামর্শ করছে। এমন সময় এক

প্রহরী এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে খবর দিল—রাজা সামন্ত সিং এসেছেন।

—আরে নিয়ে এস, নিয়ে এস। ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। যেন ওঁর জন্যেই অপেক্ষা করে আছে ওরা।

—সামন্ত সিং ছাউনির মধ্যে ঢুকে মাথা নুইয়ে রাজপুত্রদের অভিবাদন করে বললেন—রাজকুমারগণ। আপনাদের ইচ্ছেই পূর্ণ হয়েছে—মন্ত্রণা সফল! আজই শিবির সরিয়ে পোড়ো জমিতে নিয়ে যাবার আদেশ দিন। সাধারণ মানুষদের নিজেদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ঝগড়া লাগিয়ে দিতে পারলেই আমাদের রাজাদের পথ পরিষ্কার! তাহলে কাল থেকেই হাঃ—হাঃ—হাঃ!!

পরের দিন শিকারের দল হইহই করে কালভৈরবের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। পুকুরে টানা জাল দিয়ে মাছ ধরা দেখেছ? টানা জাল দিলে একটা মাছও পালাতে পারে না। জালে আটকায় পুকুরের মাছ।

দু-একটা তেজী মাছ জাল ছিঁড়ে বা বিরাট লাফ দিয়ে জাল ডিঙিয়ে পালায় কখনো-সখনো। ঠিক সেই রকম করে শিকারীর দল জঙ্গল-

টাকে যেন ছেঁকে নিয়ে চলল দল বেঁধে। একদিক থেকে চলন্ত দেওয়ালের মতন সৈন্যদল তীর-ধনুক, বল্লম, তলোয়ার উঁচিয়ে এগুতে লাগল রে-রে র‍্যা-র‍্যা, হুরর-হুরর শব্দ করতে করতে; আর বনের সব জন্তু-জানোয়ার প্রাণ ভয়ে দৌড়তে লাগল সেই মানুষের দেওয়ালের আগে-আগে। ঢাক, ঢোল, শিঙা আর নানান রকমের বাজনার বিকট শব্দে দারুণ ভয় পেয়ে, হরিণ, মোষ, হায়না, হাতি, বাঘ, সিংহ, খরগোশ, বনবেড়াল, গুলবাঘ, গেছো বাঘ, কালো বাঘ, বাঁদর, বনমানুষ সব দৌড়তে লাগল পাশাপাশি। খালি সাপগুলো ছুটল না সবাই। অজগর সাপগুলোর নড়তে-চড়তে সময় লাগে অনেক। তার ওপর যদি আস্ত বুনো শুয়ার, হরিণ বা মোষ গিলে খেয়ে থাকে তো কথাই নেই! পথে কয়েকটা অজগর সাপকে ওরা কেটে টুকরো টুকরো করে দিল। সাপের কামড়ে কয়েকটা ঘোড়া আর কিছু সৈন্য মারাও পড়ল। বনে কত রকমের পাখি, ময়ূর, ময়না, হীরামন, সারস, বক, কাকাতুয়া, টিয়া, চন্দনা, তিতির, ল্যাজকোলা হাঁস, হরিয়াল, চকাচকি, কতো রঙবেরঙের নাম-না-জানা পাখি আর হুতুমপেঁচা সব আকাশ ছেয়ে উড়তে লাগল।

দশক্রোশ জঙ্গলের ওদিকের বাসমতী গ্রামের লোকেরা হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল যে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি জঙ্গলের দিক থেকে তাদের গ্রামের দিকে উড়ে আসছে। আর কি যেন একটা গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে দূরে, অনেক দূরে।

ব্যাপারটা যে কি কেউ ঠিক বুঝতে পারল না। ছোটরা মহানন্দে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে লাগল তো দেখতেই লাগল। বড়রা যেন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

গ্রামের সকলের প্রিয় গণদেব তখন হিরণ্যরেখা নদার দুর্দান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ছে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সে সাঁতার দিয়ে নদী তোলপাড় করছে। ঐ ভয়ংকর নদী বার বার পার হচ্ছে। ঘূর্ণি জলের সঙ্গে লড়াই করে সকলের আগে পৌঁছচ্ছে, কখনো বা গা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে স্রোতের টানে কিছু দূর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। এবারে

বসন্তকালে সারা রাজ্য জুড়ে সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে, তাতে গণদেব আর বাসমতী গ্রামকে প্রথম হতেই হবে। এই তাদের সাধনা। স্রোতের দিকে চিৎ সাঁতার দিয়ে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ ভ্রূ কোঁচকালো গণদেব। আকাশে কি হঠাৎ কালো মেঘ উঠল? মেঘ কি তেড়ে আসছে? একটু ভাল করে দেখতেই ভুল ভাঙল। ঝাঁকে ঝাঁকে

পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে। কালভৈরবের জঙ্গলের সব পাখিই যেন আকাশে উড়েছে ভয় পেয়ে। ব্যাপারটা তো সুবিধের নয়। কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। পাখিরা আর বাঁদরেরা বিপদের খবর আগে জানতে পারে।

ও চীৎকার করে হাত তুলে সকলকে দেখাল। বলল, তাড়াতাড়ি পাড়ে চল; কিছু একটা হয়েছে।

জল থেকে উঠে দৌড়তে দৌড়তে গ্রামের মাঝখানে এসে দেখল লোকজন জড় হয়েছে মেলাতলার মাঠে। গ্রামের গাছগুলোতে পাখি বোঝাই। তাদের কিচিরমিচির কিচিরমিচির শব্দে আর কিছু শোনাই যায় না। পাখির ভারে যেন গাছগুলো ভেঙে পড়ছে। তার ওপর বাঁদরের দল হুপ্‌হাপ্ লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রামের গাছ-গাছালি নষ্ট করছে।

গ্রামের মোড়ল গণদেবকে দেখে বললেন, তোমাকেই খুঁজছিলুম। এর একটা বিহিত করতেই হবে দেবু। আমাদের মধুগন্ধে ভরা লক্ষ্মীর

আসন সোনার বাসমতী গ্রাম যে ধ্বংস হয়ে যাবে গো! রাজপুত্রেরা এমনই মৃগয়ায় বেরিয়েছেন যে, দুর্ভিক্ষ না ঘটিয়ে ছাড়বেন না। রাজার কি হঠাৎ মতিভ্রম হল? এমন তো ছিলেন না! একি বিচার! হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে? গণদেব বলল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা কিছুতেই ক্ষতি করতে দেব না। দলবেঁধে গিয়ে কুমারদের সঙ্গে দেখা করব, বাধা দেব! গতবারের নৌকো চালানোয় হেরে গিয়ে বোধ হয় ওদের আক্রোশ হয়েছে! বিবেকবুদ্ধি দেখুন! হিংসে মেটাতে নিজেদের রাজ্যের ক্ষতি করে এরা। দেশের মানুষকে শত্রু ভাবে! এরা লক্ষ্মীছাড়া। আমি তৈরি হয়ে আসছি। বন্ধুদের সকলকে ডাকতে বলে, ঝড়ের বেগে গণদেব নিজের কুঁড়েঘরে গেল।

একটু খাওয়াদাওয়া করে, পাকা বাঁশের তেল-মাখানো লাঠিটা নিয়ে মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল সে।

দলবলকে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে বনের দিকে যাত্রা। সঙ্গে মাত্র ত্রিশজন গ্রামের তেজী ছেলে। তাদের কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে বল্লম, টাঙি বা তলোয়ার।

ফসলের ক্ষেত আর মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের কাছাকাছি যেতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। আর একখানা মাঠ পেরোলেই জঙ্গলের ছোটখাটো আগাছায় উঁচুনীচু রুক্ষ মাটির রাজত্ব শুরু হবে। শেষের ক্ষেতটা থেকে থেকে মিষ্টি ফুলের মতন ধানের গন্ধ আসছে। গন্ধরাজ ধানের গাছে ফিকে সোনালি রঙ ধরেছে। বাসমতী গ্রামের মাটির গুণে আর হিরণ্যরেখা নদীর জলের গুণে, সারা বছরই ধান হয় এ-গ্রামে। ধানের গন্ধে নিশ্বেস নিলে সারা দেহে শক্তি আসে, ক্লান্তি চলে যায়। ওরা বুক ভরে নিশ্বেস নিতে নিতে এগিয়ে চলল।

এদিকে মকরকুমার আর কুবেরজিৎ করেছে কিনা, কয়েকজন বন্ধু রাজপুত্র আর এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে ঐ ক্ষেতটার পেছেন জঙ্গলের মধ্যে এসে চুপচাপ ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। কখন গ্রামের লোক-জনের নেতা হয়ে গণদেব আসে, তারই অপেক্ষায়। জঙ্গলের মধ্যে

লুকিয়ে ওরা মাঠের আল-পথের ওপরে চোখগুলোকে রেখেছে দুরবীনের মতন। কিছু সৈন্যকে গাছের ওপরে চড়িয়ে নজর রাখতে বলা হয়েছে। হঠাৎ এক বিরাট শালগাছের ওপর থেকে একজন গুপ্তচর জানালো একটা দলকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

খুব উঁচু কালো ঘোড়াটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মকরকুমার দেখল হ্যাঁ, ঠিক-ই! গণদেবের পাথরে কোঁদা চেহারাটাকে চিনতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। তার লম্বা কোঁকড়ানো চুল, পাকানো সুন্দর ধনুকের মতন গোঁফ, তেলমাখা শরীর, সূর্যের আলোয় চকচক করছে।

মকরকুমার পেছিয়ে এস সকলকে বলল—এবার তৈরি হোন সবাই, দুর্লভ সুযোগ। যা চেয়েছিলাম তাই হতে চলেছে! প্রথম শিকারই সিংহ শিকার হবে! রাজকুমার বন্ধুরা আমার। জেনে রাখুন, আমাদের, ভবিষ্যতের রাজাদের পথের কাঁটা ঐ গন্ধরাজ ধানের ক্ষেতের ওপাশের আলের পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

সকলে দলবল নিয়ে জঙ্গলের শেষ সারির গাছগুলোর আড়ালে এসে দাঁড়াল।

গন্ধরাজের গন্ধে জঙ্গল 'ম-ম' করছে। গণদেবরা আলের পথ ধরে যেই না ক্ষেতের মাঝ বরাবর এসেছে, অমনি কুবেরজিৎ আদেশ দিল—এবার ছেড়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে ওর লোকজন একপাল হরিণ আর কয়েকটা বুনো শুয়োরকে মাঠের দিকে মুখ করে ছেড়ে পেছন থেকে তাড়া দিল—হুই হ্যাট হ্যাট, হুই।—

কুবেরজিতের আদেশে ঐ হরিণ আর শুয়োরগুলোকে জঙ্গল থেকেই ধরা হয়েছিল, মারতে দেওয়া হয়নি। কি শয়তানী বুদ্ধিটাই না ফেঁদেছিল মকরকুমার আর কুবেরজিৎ।

ছাড়া পেয়ে আর তাড়া খেয়ে, প্রাণের দায়ে, হরিণ আর শুয়োর-

গুলো তীরবেগে পাশাপাশি দৌড়তে লাগল গন্ধরাজ ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঘূর্ণি ঝড়ের মতন। যেন হরিণ আর শুয়োরের হাজার গজ দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

আর ওগুলোর পেছনে পেছনে—র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা, ভ্রর্‌র্‌-ভ্রর্‌র্‌, কুৎ-কুৎ শব্দ করতে করতে এক বিরাট বাহিনীর সঙ্গে কয়েকজন রাজপুত্র গন্ধরাজ ক্ষেতের সর্বনাশ করতে করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল খপ্‌-খপ্‌ খপ্‌-খপ্‌। মকরকুমার আর কুবেরজিৎ কিন্তু গেল না। একটা গাছের তলায় মখমলের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে, আঙুরের রসের মদ খেয়ে, ক্লান্তি দূর করতে লাগল।

এদিকে মাঠের মাঝামাঝি এসে গণদেবরা এই দৃশ্য দেখে, থমকে পাথরের থামের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রায় ওরই মতন শক্তিশালী প্রবলকুমার। প্রবল বলল, ও দেবু, একি কাণ্ড ওরা ইচ্ছে করে সর্বনাশ করছে যে রে!

—যা ভেবেছিলাম তাই হচ্ছে প্রবল। কিন্তু আমরা কি চুপ করে সয়ে যাব?

—কখ্‌খনো না। প্রাণ দিয়ে ধান বাঁচাব। ধানটা আমাদের মান, আমাদের অধিকার—সকলের প্রাণ।

—তাহলে এক কাজ করি এস। ওগুলোকে ক্ষতি করতে না দিয়ে, সাবধানে এগিয়ে ঘিরে ফেলি। শুয়োরগুলোকে মেরে ফেলতে হবে। হরিণগুলোকে মেরো না। তারপরে ওদের সঙ্গে বোঝা-পড়া।—চল।

ওরা উল্টো দিক থেকে ওগুলোকে তাড়া করল। দু'দিক থেকে তাড়া খেয়ে ওগুলো থমকে দাঁড়াতেই গণদেবদের বল্লমের ঘায়ে শুয়োর-গুলো ধানক্ষেতে মুখ থুবড়ে পড়ল, হরিণগুলো পড়ল ধরা।

রাজপুত্ররা ব্যাপার দেখে ক্ষেপে গিয়ে সৈন্যদল নিয়ে ওদের দলটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লে।

—আমাদের শুয়োরগুলোকে মারলে কেন? কে—কে মারল?

—আমি মেরেছি। গণদেব সামনে থেকেই বলল—ওগুলোকে কি

আপনারা দৌড়নো শেখাচ্ছিলেন? ধান ক্ষেত নষ্ট করা শেখাচ্ছিলেন বুঝি?

—আমাদের শিকারে হাত!—

গণদেবের দলের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল—মনে হচ্ছে যেন আপনাদের কয়েকজন আত্মীয়কে মারা হয়েছে। ওগুলো তাহলে শিকার ছিল না. তাই বলুন! মা-বাবা মারা গেলে মানুষ এমনি করে!

— কে বলল? ওকে ধরে নিয়ে এস হীরকদ্বীপের রাজকুমার আদেশ দিল।

—এখানে যে যা বলছে করছে সব আমি বলছি করছি ধরে নিতে পারেন। এখন আমার কথার উত্তর দিন—কেন আপনারা আমাদের সোনার শস্য নষ্ট করছেন? বলল গণদেব। চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র তেড়েমেড়ে বলল– সে প্রশ্ন করার তুমি কে? যাঁর রাজ্যে আমরা অতিথি হয়ে এসেছি যিনি নিজে আমাদের শিকার করতে পাঠিয়েছেন, উত্তর চাইলে তাঁকেই দেব।

প্রবল তখন প্রবলবেগে বলল—শস্য আমরা গায়ের রক্ত দিয়ে ফলাই। রাজা ফলাতে আসেন না। তিনি কর নেন, তাতে আপনাদের মতন অতিথিদের সৎকার হয়। আমোদ-প্রমোদ. বিলাস আর ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা হয়, বুঝেছেন?

—কি, এত বড় কথা। অন্যায়ে করে আবার চোখ রাঙানো। হীরককুমার বলল—সেনাপতি, ওদের বন্দী করো। রাজা এই অপমানের বিচার করবেন। আমাদের অপমান মানেই ধনপতি রাজার অপমান, রাজপুত্রদের অপমান।

চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমার চন্দ্রকেতুকে চোখ টিপে ইশারা করতেই সেনাপতি বুঝে নিয়ে সৈন্যদের আদেশ দিল—বন্দী কর!

আদেশ পেয়ে সৈন্যরা চারদিক থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঢাল, তলোয়ার, বর্শা আর ঘোড়া নিয়ে।

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। গণদেবের দলের ছেলেরা শুধু লাঠি বল্লম আর টাঙ্গি নিয়ে বাঘের মত লড়াই করতে লাগল। বন্‌বন্‌ ক'রে এমন লাঠি ঘুরতে লাগল যে, মনে হল কয়েক হাজার ভ্রমর ক্ষেপে গিয়ে এক সঙ্গে ডাকছে। ঠকাঠক—ঠং-ঠাং লাঠির আর তরোয়াল-টাঙির লড়াইয়ের শব্দ উঠল। মুখে আস্ফালনের শব্দ—

চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র গণদেবকে আক্রমণ করল। তলোয়ার উঁচিয়ে গণদেবকে যেই না মারতে যাওয়া, গণদেব অমনি বিদ্যুৎগতিতে লাঠি ঘুরিয়ে তলোয়ারের মার আটকেই দেয়নি, এমন লাঠি চালিয়েছে যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমারের হাত থেকে তলোয়ারটা দশহাত দূরে ছিটকে পড়েছে। তারপরে এমন লাঠি চালাল যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা সকালের চাঁদের মতই ঘোড়া থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। হইহই উঠল চারদিকে! এদিকে গণদেবের সঙ্গীদের লাঠির ঘায়ে প্রায় ত্রিশটা ঘোড়সওয়ার সৈন্য কাদায় পড়ে কাত্‌রাচ্ছে। ঘোড়াগুলো চোট্‌ খেয়ে ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে হরিণগুলোর মতই ভোঁ-ভোঁ দৌড়ুচ্ছে। কতকগুলো ঘোড়ার পা কাদায় গেঁথে গেছে, সেগুলো নড়তে-চড়তে পারছে না, মুখ থুবড়ে কাদায় পড়ে যাচ্ছে।

গণদেবের দলেরও কয়েক জন বর্শা তলোয়ারের ঘায়ে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে।

হীরককুমার আর তুষারদ্বীপের রাজপুত্র তুহিনকুমার ব্যাপার দেখে আদেশ দিল—ঐ শয়তানকে সব্বাই মিলে আক্রমণ কর! ওকে ঘিরে ফেল।

—তাই কর কাপুরুষের দল! গণদেব বলল।

—চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমার এখন 'অর্ধচন্দ্র' দ্বীপের রাজকুমার হয়ে গেছে, কিংবা অর্ধচন্দ্রকেতু হয়ে গেছে।

সাহস থাকে তোরা নিজেরা যুদ্ধ কর! প্রবল চীৎকার করে বলল গণদেব।

সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে পালের গোদাকে ধর। বলে হাঁক ছেড়ে একজন সেনাপতি গ্যাঁক গ্যাঁক শব্দ করতে করতে গণদেবের দিকে ঘোড়া ছোটালো। গণদেবের সঙ্গীরা বিপদে দেখে গণদেবকে পেছনে ঠেলে দিয়ে, ওকে আড়াল করে, লাঠি আর বল্লম চালাতে লাগল ঘোড়াগুলোর পায়ের ওপর। বিশ-পঁচিশটা ঘোড়া তাদের সওয়ার নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ওদের মারের চোটে। খেলাঘরের মাটির ঘোড়ার পা ভেঙে গেল যেমন করে পড়ে, তেমনি করে পড়ল ঘোড়াগুলো।

কিন্তু পাঁচশো লোকের সঙ্গে পঁচিশ জন পারবে কেন? যতই কেন জোর আর সাহস থাক, অত লোকের সঙ্গে লড়াই করা তো সম্ভব নয়। তাই শেষে গণদেবের সঙ্গে বারো জন বন্দী হল। বাকীরা জীবন দিয়ে গণদেবকে রক্ষা করল। গণদেবের গায়ে বিশেষ আঘাত লাগতে দেয়নি। যে বারো জন বন্দী হল ওর সঙ্গে, তাদের সকলের গা থেকে ঝরণার মতন রক্ত ঝরতে দেখা গেল।

ঐ ক'জনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রাজপুত্র আর সৈন্যরা হিমসিম খেয়ে গেল। সৈন্যদের প্রায় সকলেরই কোন না কোন চোট লেগেছে। রাজপুত্রদের ননীর শরীরে আঘাত লেগে সে এক কাণ্ড। ঝকঝকে

উজ্জ্বল রঙের রক্ত পড়ছে তাদের গা বেয়ে। তারা সবাই যন্ত্রণায় এলিয়ে পড়েছে—ধর-ধর অবস্থা।

তুহিনকুমার উঃ আঃ করতে করতে জিজ্ঞাসা করল—ধরা পড়েছে?

সেনাপতি বললেন—হ্যাঁ রাজপুত্র, সিংহকে জালে জড়ান গেছে।

হীরককুমার কাতরাতে কাতরাতে বলল—বাঁচালেন। উঃ বাপ্‌স!

তা শুনে প্রায় অজ্ঞান চন্দ্রকেতু নড়েচড়ে উঠল—আঃ! বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

—বাব্বা! কি ভয়ংকর শক্তিরে বাবা! ভয়ও হয়, ভক্তিও হয়। —একজন রাজপুত্র বলল।

—আর কিছু লোকজন নিয়ে যদি আসত, তাহলে আমাদের আর ফিরে যেতে হত না। এই ধান ক্ষেতের কাদার নিচেই স্বর্গ খুঁজে নিতে হত। হীরককুমার বলল।

—উঃ! বাপ্! এমন যুদ্ধ কখনো করতে হয়নি। তুহিনকুমার বলল।

গণদেবকে তার দলবলের সঙ্গে বন্দী করে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে গেল ওরা। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। জঙ্গলের মাঝখানে আগেই অন্ধকার নেমে আসে। সেখানে কয়েকটা তাঁবুর মধ্যে আর বাইরে মশালের আলো জ্বলছে। চারিদিকে কয়েকশো মরা পশু আর পাখি ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাঁবুগুলোর মাঝখানে সোনা-রঙের মখমলের একটা তাঁবু। পাশের দুটো তাঁবু থেকে হরিণের মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। ক্লান্ত গণদেব ও আরো ক্লান্ত রাজপুত্রদের নিয়ে সৈন্যরা সেই সোনা-রঙের তাঁবুর মধ্যে গেল। সেখানে পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে মকরকুমার আর কুবেরজিৎ বসে হাসি-ঠাট্টা করছে ও পান ভোজন করছে। হাসির হররা ছুটছে। কারণ বেশ কিছুক্ষণ আগেই সেই গাছের তলায় এসে ঘোড়সওয়ার বার্তাবহ খবর দিয়ে গিয়েছিল যে সিংহ ধরা পড়েছে, শিকার অভিযান সফল হয়েছে, আসল শিকারের কাজ সম্পূর্ণ।

ওদের নিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢোকার সময় প্রহরীরা হাঁক পাড়ল—রাজদ্রোহী বন্দীরা উপস্থিত।

রাজকুমারদের সামনে এসে গণদেব নির্ভীকভাবে তাকিয়ে রইল।

কুবেরজিৎ বলল, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে, নেতামশাই?

—'কোথায়' বলে মনে না পড়ার ভান করছেন কেন? আপনি ভালভাবেই জানেন, কোথায় দেখেছেন। আমাকে হাড়েহাড়েই চেনেন।

—এবার তুমিও হাড়ে-হাড়েই চিনবে আমাদের। মকরকুমার বলল—ক্ষমতা আর জনপ্রিয়তার গর্বে তুমি এমনই উন্মত্ত হয়েছ যে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার স্পর্ধা হয়েছে তোমার। তুমি রাজ-অতিথিদের আঘাত করেছ। জান, এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বিদ্রোহ? এটা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তুমি তার নায়ক। এর শাস্তি জান?

—আমি নায়ক বটে, তবে আপনারা যে-সব কীর্তির কথা বললেন তার নায়ক নই। আমরা আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা আক্রমণ করেছি। যারা দেশের সোনার ফসলকে নষ্ট করে, চাষের জমির ক্ষতি করে, তারা দেশের বন্ধু নয়, বাঞ্ছিত অতিথিও নয়।

আর যাঁরা তাঁদের ঐ পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁরা রাষ্ট্রের হয়ে কথা বলার অধিকারী নন। ফসল রক্ষার জন্য যাঁরা লড়াই করেন তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

—ঠিক আছে। তোমার স্পর্ধা, তোমার তেজ কেমন থাকে দেখা যাবে। মকরকুমার বলল—আমরা এখুনি বিচার করে শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু তা দেব না, রাজাই এর বিচার করবেন। তাঁর জানা দরকার তাঁর রাজত্বে প্রজাদের কেমন বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, তেজ হয়েছে। আমরা তোমাকে তাঁর কাছেই নিয়ে যাব।

—বিচারের অধিকার আপনাদের বা রাজার তো থাকবেই। গণদেব মেঘডাকার মতন কণ্ঠে বলল—পৃথিবীতে যার জনবল, ধনবল আর শক্তি,

বিচারের অধিকার তো তার একচেটে। তার পক্ষের অন্যায়ের বিচার হয় না। বিধিবিধান তার সুবিধে অনুযায়ী তৈরি হয়। বিচার-ব্যবস্থা হয় সেই মতন সাজানো। কথা সাজিয়ে, যুক্তি তৈরি করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যে দোষ প্রমাণ করার নামই বিচার।

—মাননীয় রাজকুমারগণ! আপনারা শুনলেন—এ, কি বলল? সৈন্যরাও সাক্ষী থাকল সবাই। এ কথা রাজার কাছে বলবেন সবাই। গণদেব বলল—সাক্ষীর কি দরকার? আমি তো নিজেই আবার রাজাকে বলব এ-কথা। কারণ আমরা সত্যটাকেই ধর্ম বলে পুজো করি; নীতি, বিধান বলে মানি। আমাদের বিচারে সাজান সাক্ষীর দরকার হয় না। তবে আরো মিথ্যের রঙ যদি চড়ানর দরকার থাকে তো আলাদা কথা।

গণদেব হাসতে লাগল। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। রাজকুমাররা ভেতরে ভেতরে দাঁতে-দাঁত ঘষল। অতিথি রাজপুত্ররা সবাই মনে মনে ভাবল এবার রাজকন্যা মণিদীপা আমার।

আর কুমাররা ভাবল—বাব্বা! এত সহজে যে কার্যোদ্ধার হবে ভাবাই যায়নি। নিষ্কণ্টক অভিযান সার্থক!

পাঁচ

ধনপতি রাজার সভায় লোক আর ধরে না।' সত্যি, একটা তিল পর্যন্ত রাখার জায়গা নেই সভায়, এত লোক, এত ঠেলাঠেলি। দেশ-বিদেশ থেকে লোকজন এসেছে বিচিত্র সব পোশাক-পরিচ্ছদে নিজেদের গরগরে করে। কারুর মাথার পাগড়িতে নীলকণ্ঠ পাখির পালক, কারুর মাথায় সোনার মুকুটে হীরের সূর্য জ্বলছে। দেশ-বিদেশের রাজা আর রাজপুত্ররা রাজার দু'পাশ আলো করে বসেছেন। পাত্র মিত্র সভাসদ্, পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রকার, ন্যায়াধীশ, সমস্ত রাজা আর রাজ্যের গণ্যমান্যেরা বসেছেন তারপরে। সাধারণ প্রজারাও এসেছে দলে দলে। তারা একটু দূরে স্থান পেয়েছে।

আজ বিশেষ সভা, বিচারসভা। সকাল থেকে ঝলমলে রোদে দূর দূর থেকে ঘোড়ায় চড়ে, হেঁটে, পালকিতে করে দলে দলে লোক আসছে। তাদের মুখে একটিমাত্র কথা—রাজার বাড়িটা কোনদিকে?

যেদিকে দলে দলে লোক যাচ্ছে সেইদিকে, আবার কোন দিকে? এই রাস্তাই তো রাজবাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। চলে যাও ভাই। কেউ মন্তব্য করল।

সবাই চলে। তাদের কথাবার্তায় কালভৈরবের জঙ্গলের পাখিদের মনে পড়ে যাবে।

চারদিকে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছে—রাজসভায় প্রজাদের সামনে রাজদ্রোহীদের বিচার হবে। রাজার ন্যায়, নীতি আর উদারতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে ইন্দ্রের সমান রাজা ধনপতি সকলের সামনে বিচার করে দেখাতে চান যে, বাসমতী গ্রামের বিদ্রোহীরা কতটা অন্যায় করেছে। তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখেই দেখতে চান।

মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেছে গণদেবের লড়াইয়ের কথা। সাধারণ মানুষ তাই দেখতে যাচ্ছে ঐ অসাধারণ সাধারণ মানুষটিকে।

গণদেবের নাম সবাই জানে। হিরণ্যরেখা নদীতে নৌকো

প্রতিযোগিতার জয় সাধারণ প্রজাদের গর্ব, গৌরব। সূর্যের আলোর মতন তার জয়ের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাসমতী আর দেওদার গ্রামের সব মানুষই এসেছে রাজসভায়। তবে রাজা সামন্ত সিং দেওদার গ্রামের প্রজাদের নিয়ে সকলের আগে এসেছে এবং রাজার খুব কাছাকাছি বসার জায়গা করে নিয়েছে। গণ্যমান্য লোকেদের ঠিক পরের সারিতে বসেছে দেওয়ার গ্রামের লোকেরা।

রাজার পেছনে পাতলা রেশমের জালের আড়ালে রানীরা বসেছেন, রাজকন্যা বসেছে আর রাজবাড়ির অন্যান্য মহিলারা সব বসেছেন— রাজার বোন, মাসি-পিসি থেকে পরিচারিকারা সবাই।

এমন সময়ে শিঙা বেজে উঠল। ঘোষক ঘোষণা করল— মহামহিমান্বিত, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, প্রজাপালক, প্রজানুরঞ্জক, ন্যায়াধীশ, ইন্দ্র সমান মহামান্য মহারাজ ধনপতি শত্রুদমন সভায় পদার্পণ করে আমাদের ধন্য করছেন!—

সভাসুদ্ধ লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠল। রাজা সোনা হীরে বাঁধানো হাতির দাঁতের সিংহাসনে বসলে সবাই হর্ষধ্বনি করে, রাজাকে স্বাগত জানিয়ে বসলেন।

একজন শাস্ত্রজ্ঞ সোনায় গড়া হীরে চুনী পান্না মুক্তা বসানো রাজদণ্ড দিলেন রাজার হাতে মন্ত্রপাঠ করতে করতে। দু'জন পরীর মতন মেয়ে হালকা চামর দিয়ে রাজাকে হাওয়া দিতে লাগল।

বৈতালিকেরা নানা সুরে মিষ্টি বাজনা বাজাতে লাগল। বাজনা ধীরে ধীরে কমে বন্ধ হয়ে গেলে, মন্ত্রীমশাই তাঁর সাদা দাড়ি নেড়ে পাগড়ির হীরের আলো ছড়িয়ে ঘোষণা করলেন—আজকের সভাটি একটি বিশেষ বিচারসভা। এই সভায় রাজদ্রোহিতার বিচার হবে। মহামান্য রাজাধিরাজ ধনপতি বাহাদুরের ন্যায় বিচার সারা পৃথিবীকে পথ দেখাবে। ন্যায় বিচারই রাজার সবচেয়ে বড় গুণ আর প্রধান কর্তব্য। তাই কখনো কখনো সহানুভূতিতে গলে গেলেও, তাঁকে

নির্মম কঠিন ব্যবহার করতে হয়—নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে হয়। আবার কখনো আপাতরুক্ষতার আড়ালে মায়ার কোমলতার ফল্গুধারা বয়ে চলে। আজ মহারাজ তুলনাহীন বিচার করবেন। এ বিচারের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, ভাগ্য নির্ভর করছে, সুখ সমৃদ্ধি শৃঙ্খলা নির্ভর করছে। মন্ত্রীমশাই সভাসদদের হর্ষবধ্বনির মধ্যে বসে পড়লেন। এবার রাজা নরম অথচ গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করলেন—বন্দীদের নিয়ে এস! ওদের যেন কেউ অসম্মান না করে। কারণ ওদের দোষ এখনো সকলের সামনে প্রমাণিত হয়নি। ওরা নির্দোষ, প্রমাণিত হতেও পারে।—

সবাই নিশ্বেস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল যে পথ দিয়ে বন্দীশালা থেকে বন্দীদের আনা হচ্ছে—সেই পথের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল প্রহরী হুঁসারে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে এসে রাজাকে অভিবাদন করে দাঁড়ালো। তাদের শিরস্ত্রাণ থেকে আলো ঠিকরে পড়তে লাগল।

তারপরেই হুসার সৈনিকের মাঝে—হাতে বেড়ি, বন্দীদের আনা হল। ঝনঝন্ করে বেজে উঠল তাদের হাত-পায়ের শেকল।

প্রথমেই সোজা হয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো গণদেব। যেন কালো পাথরে

কোঁদা চেহারা। ঝাকড়া কোঁকড়ানো কালো কুচকুচে চুল, আর মুখে নরম কোঁকড়ানো দাড়ি বেরিয়েছে ক-দিনের বন্দীশালার জীবন।

তাকে দেখে সভার সাধারণ মানুষদের মুখ থেকে কেমন যেন শব্দ বেরুতে লাগল—আহারে! শব্দটা আর চিক্‌চিক্ শব্দটাই শুধু বোঝা গেল। সকলের দীর্ঘনিশ্বাসটা এক সঙ্গে যেন ঝড়ের মতন শোনা গেল। এ-রাজ্যে গণদেব বিখ্যাত এবং সকলের প্রিয়। হিরণরেখা নদীতে নৌকো চালানোর, সাঁতার কাটার গল্প লোকের মুখে-মুখে।

রাজা, মন্ত্রী, রাজকুমাররা খুব সতর্কভাবে সভার লোকেদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করতে লাগলেন। একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন সবাই।

রাজা মশাইকে দেখে শুধু মনে হল যে তিনি নিরপেক্ষ, ঠিক রাজার মতই উদার, গম্ভীর, দয়ার অবতার!

রাজার মুখ দেখে প্রজারা আশ্বস্ত হল। হ্যাঁ, রাজার মতন রাজা। এঁর কাছে অন্যায় অবিচার হতেই পারে না। প্রত্যেকটি প্রজাকে উনি নিজের ছেলের মতন ভালবাসেন বলে সবাই শুনেছে। তাছাড়া গণদেব যে রাজ্যের সকলের বড় আদরের। কাজেই প্রজাদের মনে কষ্ট হবে এমন কাজ রাজা কখনোই করবেন না।

রাজা একবার ঘাড়টাকে একটু ফিরিয়ে অন্দরমহলের দিকে আড়চোখে তাকালেন। কান পেতে যেন কিছু শুনলেন। সভার কেউ কিছু শুনতে পেল না। রাজার কাছের সভাসদরাও কান পাতল। তবে কি রেশমের জালের আড়ালে পুরোনারীদের কাছ থেকে কিছু শব্দ আসছে? দূরের কেউ কিছু ঠিক বুঝতে পারল না।

মন্ত্রীমশাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বন্দীদের বললেন—তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে—যা সত্য তাই বলবে। যা সত্য বলে বিশ্বাস কর তাই বলবে, মিথ্যা বলবে না। সত্য গোপন করবে না!

গণদেব বুক সোজা করে বলল—বন্দীদের পক্ষ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করে ঘোষণা করছি, সব সত্য বলব, সত্য গোপন করব না, যা সত্য

বলে বিশ্বাস করি তাই বলব, তবে প্রশ্নের মধ্যে কোনো ভান বা সত্য গোপন যেন না থাকে !

রাজা ধনপতি ভ্রূ-কুঁচকে নিজেকে সামলে নিয়ে গণদেবকে বললেন—বন্দী, তোমার পরিচয় দাও ? কি নাম, কোথায় নিবাস ? পিতার নাম ?

গণদেব—মহারাজ অপরাধ নেবেন না ! আপনার এ-প্রশ্নে ভান আছে, সত্য গোপন করা আছে। কারণ আপনি আমার নাম-ধাম সবই জানেন। তাই বললাম না। পিতার নামটা মনে না থাকতে পারে, তাই বলছি—শ্রীসদাশিব মাঝি। এ-কথা শুনে সভার পেছনে কারা যেন ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হেসে উঠল।

রাজামশাই রেগে টং হয়ে বললেন—বন্দী, তোমার ঔদ্ধত্য দেখার জন্যে সবাই এখানে আসেন নি। নাম-ধাম বলা নিয়ম—সর্বসমক্ষে বলতে হবে।

গণদেব—নিয়মের কথা বলছেন ? নিয়ম কি সত্যকে চাপা দেবে মহারাজ ? ভিন্‌দেশের রাজা-রাজপুত্ররাও আমার নাম-ধাম জেনে গেছেন।

রাজা—তুমি বাসমতী গ্রামের গণদেব মাঝি। ওখানকার নেতা এ-কথা সত্য কিনা ?

গণদেব—আপনার কথার প্রথম অংশটা ঠিক। তবে আমি ওখানকার নেতা কিনা বলব কি করে ? নিজেকে নেতা বলা যায় না মহারাজ। সবাই নেতা রূপে মেনে নিলে তবেই নেতা হওয়া যায়। এ-ব্যাপারটা রাজতন্ত্রের মতন তো নয়, যে রাজার ছেলে হলেই রাজা হবে। তাছাড়া একজন সব ব্যাপারে নেতা হতে পারে না।

রাজা তুমি এই দলটার নেতা তো ?

গণদেব—এই দলটা যে মহৎ কাজে বেরিয়েছিল আমি তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম আমার সহযোগী এই প্রজাদের সঙ্গে। দায়িত্ব সব আমার।

রাজা—তুমি দল বেঁধে মৃগয়া-অভিযাত্রী আমার অতিথিদের আক্রমণ করেছ। বহু সৈন্যকে হত্যা করেছ বা আহত করেছ; অতিথি রাজকুমারদের কয়েকজনকেও আহত করেছ। এ-কথা সত্য কিনা?

গণদেব—মহারাজ, আপনার অভিযোগের মূলটাই অসত্য, তাই বাকি ঘটনাগুলো মিথ্যার আড়ালে ঢাকা পড়ে, মিথ্যা হয়ে যেতে বসেছে। আমি বা আমরা আক্রমণ করিনি। রাজ অতিথিরা সৈন্যদল নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ চালালে আত্মরক্ষার জন্য আমরা পাল্টা আক্রমণ করেছি। তাতে বহু সৈন্য ঘোড়া আর অতিথি হতাহত হয়েছে।

রাজা—ওঁরা কি তোমাদের গায়ে পড়ে ঝগড়া আর মারামারি করতে গেছলেন? তোমাদের সঙ্গে কি ওঁদের শত্রুতা ছিল, না রাজত্বের অধিকার নিয়ে লড়াই ছিল?

গণদেব—মহারাজ, আপনি পরম জ্ঞানী। আপনি জানেন যে যাঁরা প্রবল তাঁরা সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা করেই চুপ করে থাকেন না, নিপীড়ন করে আনন্দ পান। শক্তি দেখানোর, যা খুশি করার, অধিকারটাকে ফলাতে চান। পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশাও যুদ্ধের একটা প্রধান কারণ। কি উদ্দেশ্যে জানি না, ওঁরা তিন চারশো লোকে মিলে কয়েকটা হরিণ আর শুয়োরকে তাড়িয়ে আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে বোনা গন্ধরাজ ধানের ক্ষেতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ননীর দুলালরা শিকার করতে জানে না দেখে আমরা উল্টো দিক থেকে আক্রমণ করে চটপট শুয়োরগুলোকে মেরে আর হরিণগুলোকে ধরে আপনার রাজত্বের সমৃদ্ধির মূল, রাজস্বের উৎস, রাজত্বের লক্ষ্মী ধানক্ষেতকে বাঁচাই। তাতে ওঁরা এটাকে অপরাধ ধরে নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে!

রাজা—তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওখানে কি করতে গিয়েছিলে? দেশের সাধারণ মানুষ দিন দুপুরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কি শুধু-শুধুই ঘোরাফেরা করে?

গণদেব আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবার কারণ ছিল। ভোর থেকেই কিংবা আগের রাত থেকেই ওঁরা কালভৈরবে জীবজন্তু, হনুমান ও পাখিদের তাড়িয়ে আমাদের গ্রামের দিক পাঠিয়েছিলেন। ফলে গ্রামের ফলন্ত শস্যের দারুণ ক্ষতি হয়। আমরা জীবজন্তুদের বনের দিকে ফিরিয়ে দেবার আর প্রতিবাদ করার জন্যে ওদিকে গিয়ে ছিলাম।

দেশের সম্পদ রক্ষা করতে যাওয়া, মানুষের জীবনধারণের প্রধান শস্য বাঁচাতে যাওয়ার জন্যে আমাদের পুরস্কার পাওয়া উচিত—তার বদলে আমরা দোষী বলে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি পেতে যাচ্ছি। যে সম্পদ আমরা রক্ষা করতে গিয়েছিলাম তার জন্যেই রাজত্ব চলে, অতিথি সৎকার হয়। বিলাসবহুল শিকার অভিযানের ব্যবস্থা করা যায়!

কথাগুলো শুনতে শুনতে রাজা হঠাৎ রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর চোখ দুটো জবাফুল হয়ে গেল, মুখটা বিকেলের সূর্যের মতন লাল হয়ে উঠল। তিনি তলোয়ারের মতন গোঁফ আর জোড়া ধনুকের মত ভ্রূ-নাচিয়ে বললেন—কি, এতবড় স্পর্ধা তোমার? তুমি নিরীহ শান্তিপ্রিয় প্রজাদের উত্তেজিত করছ, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ওসকাচ্ছ? এর জন্যে তোমার আর একবার বিচার হবে।

গণদেব ধীর অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করল—প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থাটার প্রতি সত্যনিষ্ঠ কোন মানুষের শ্রদ্ধা থাকা উচিত নয়। কোনো শক্তিশালী মানুষ বা দল ছলে-বলে-কৌশলে সব ক্ষমতার আসনে বসলে, অন্যের ন্যায়-অন্যায় দোষগুণ ঠিক করে নিয়ে সেই মতন বিচার করতে বসে। আইন নিয়ম সেই মতন তৈরি করে নেয়। প্রয়োজন হলে সত্যকে পদাঘাতে জর্জরিত করে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়। নানা রকমের যুক্তির প্যাঁচে নির্দোষীকে সাজা দেয়, দোষী কাঁধ উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়। প্রার্থনা, এ-ধরনের ঘটনা যেন আপনার রাজ্যে না ঘটে।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকুমাররা, সভাসদরা এই কথা শুনে ঘিয়ে-আগুনে, তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। সবাই মিলে দাঁড়িয়ে চিৎকার

করে উঠল—এ রাজদ্রোহী। দেশদ্রোহী। এর চরম শাস্তি হওয়া উচিত।

দেওদার গ্রামের বেশ কিছু লোক ঐ সুরে সুর মিলিয়ে শাস্তি চাইল, তাদের নেতা রাজা সামন্ত সিং-এর গলাটাই সবচেয়ে জোরাল শোনাল।

রাজা রাজদণ্ড তুলে সকলকে শান্ত হতে বললেন। সভার বাকি সব লোক এক-একটা গরমের দিনের—বাতাস না-বওয়া; গাছের পাতাটি না-নড়া—বিকেলের প্রকৃতির মতন শান্ত, স্তব্ধ. নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাজা বললেন—মন্ত্রী, আপনার কি মন্ত্রণা, স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন। আমি আপনার পরামর্শে রাজ্য শাসন করি। আপনার মন্ত্রণা মতই কাজ হবে!

মন্ত্রীমশাই উঠে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, জ্যোতির্ময় ভগবান-এর নামে শপথ নিয়ে মহামহিম রাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর শ্রীশ্রীমহারাজ ধনপতি রাজচক্রবর্তীর প্রতিনিধিরূপে আমি ঘোষণা করছি যে, এই বিশাল গগন, সমুদ্র এবং শৃঙ্গচুম্বী সুবর্ণদ্বীপ রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য এই রাজ্যে রাজদ্রোহীর স্থান নেই। দুষ্ট উদ্ধত অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখের কথাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে ওরা বিদ্রোহী, দেশের শত্রু। তাই আমার পরামর্শ প্রধান দোষী শ্রীগণদেব মাঝির প্রাণদণ্ড আর সহযোগীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

এ-কথা যেই-না শোনা, অমনি রাজকুমার অতিথি আর সভাসদ এবং দেওদার গ্রামের লোকেদের মধ্যে আনন্দের হাওয়া বয়ে গেল, আর সে হাওয়াকে ছাপিয়ে বাকি সাধারণ মানুষের মুখ থেকে প্রতিবাদের বজ্রধ্বনি উঠল। সে ধ্বনি ওদের হাসিখুশির হাওয়াকে উড়িয়ে রাজ-প্রাসাদকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিতে চাইল।

সবাইকার মুখ থেকে আগুনের মতন ভাষা বেরুতে লাগল—না। কখখোনো না। এ হতে পারে না। এ অন্যায়। মন্ত্রীই দেশদ্রোহী।

ওঁকে এখুনি ফাঁসি দিতে হবে। রাজা না দিলে আমরা সবাই মিলে দেব।

রাজা রাজদণ্ডটাকে গদার মতন ঘুরিয়েও সভাকে শান্ত করতে পারলেন না। একটা প্রলয়কাণ্ড হতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যেন কি এক মন্ত্রে সভা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। সবাই যেন কি এক অপরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছে। সবাই অবাক হয়ে রাজার পেছন দিকে তাকাতে লাগল। যেন স্বর্গ থেকে কোন দেবী এসে চোখের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

হতভম্ব হয়ে দু-এক মুহূর্ত থেকে, হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি পেছন দিকে তাকালেন। তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিমূঢ়ের মতন দেখলেন, রেশমের জালের আড়াল থেকে যেন কয়েকটা আগুনের মূর্তি আলোর মূর্তি বেরিয়ে এগিয়ে আসছে। তাঁর চোখও ধাঁধিয়ে গেল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপর সভার সাধারণ লোকের তীব্র ধিক্কারের বদলে আনন্দ উচ্ছ্বাস শুনতে পেয়ে যেন জ্ঞান ফিরে পেলেন। তাকিয়ে দেখলেন, ততক্ষণে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর আদরের দুলালী. ননীর পুতুল স্বর্গমর্ত্যের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সবার চোখের মণি রাজকন্যা মণিদীপা। তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ঝরনা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, হীরে গলে পড়তে পড়তে বাইরের তাপে জমে গেছে তার দু'গালের ওপর; আর তা থেকে অপরূপ আলো বেরুচ্ছে। রাজকন্যার চোখ দুটো যেন লাল পদ্ম। রাজকন্যার পেছনে ছোটরানী আর সহচরীরা। রাজা কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। তাঁর মান-সম্মান গেল, অন্দরমহলের গোপনীয়তা নষ্ট হল। এমন সময়ে যেন নিচু পর্দায় বাঁশি বেজে উঠল—তারপর সুর চড়তে লাগল। সেতারের ঝংকার হয়ে উঠল এক একবার। রাজকন্যা মণিদীপা কথা বলছে, মৃদু থেকে উঁচু গলায়, মিষ্টি করে বলছে—বলছে—রাজ্যের সাধারণ মানুষেরা ঠিক বলেছেন। এ অন্যায়। অসহায়ের ওপর প্রবলের অত্যাচার। মন্ত্রীমশাই ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন,

রাজাধিরাজকেও করাচ্ছেন। মহামান্য রাজা মন্ত্রীকে দিয়ে অন্যায় করিয়ে নিচ্ছেন কিনা সাধারণ মানুষ তাও বিচার করবে।

অভিযুক্ত ছেলেরা যা করেছেন ঠিক করেছেন। ওরা এ-রাজ্যের সম্পদ, আসল মানুষ। আমিও এ অন্যায়ের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। ওঁকে প্রাণদণ্ড দিলে আমাকেও দিতে হবে—এখুনি ঘোষণা করতে হবে। বলেই রাজকন্যা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

সহচরীরা ধরে ফেলল। ছোটরানী কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ে রাজকন্যাকে কোলে তুলে নিলেন।

সভার সবাই হৈ-হৈ করে উঠল—রাজকন্যার জয় হোক। উনিই আমাদের রাজা—ধনপতিরাজা, রাজা নন্ !! এই গোলমালের মধ্যে মধ্যে মকরকুমার আর কুবেরজিৎ রাজার দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াল আর রাজা দুই ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে, মেঘের মতন গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলে—সব বন্দীরা ধূম্রকূট পাহাড়ের লৌহ দুর্গে সারা জীবন বন্দী থাকবে! সভাভঙ্গ! এই বলে তাড়াতাড়ি রাজা রাগে গরগর করতে করতে অন্দরমহলে চলে গেলেন। সৈন্যদল সভা ভাঙতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সভা ভাঙা গেল না।

রাজকন্যার শুশ্রূষার জন্যে, তার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে হাজার হাজার মানুষ দৌড়ে দৌড়ে আসতে লাগল...সৈন্যদলের সব রকমের অত্যাচারকে উপেক্ষা করে।

সৈন্যরা দুমদাম করে লাঠি চালাল, সড়কি বল্লম চালাল, তরোয়াল চালাল, কিন্তু তবু সাধারণ চাষী, সোনার খনির কর্মী আর হীরের খনির কর্মীদের কিছুতেই ফেরাতে পারল না। কত লোক যে আহত হল তার হিসেব হয় না, কত সৈন্যও যে আহত হল তারও হিসেব করা শক্ত। কিন্তু মরিয়া হয়ে সবাই রাজকন্যার পায়ের ধুলো নিল এক এক করে—পিঁপড়ের সারের মতন সার দিয়ে তারা এল আর ফিরে গেল—এল আর ফিরল—বহুক্ষণ ধরে এমনি অপূর্ব ঘটনা ঘটে চলল।

ছয়

রাজকন্যা শুয়ে আছে পালঙ্কের বিছানায় যেন ননীর পুতুল। কাজল-কালো একঢাল চুল ছড়িয়ে রয়েছে। যেন বিছানার উপর কালো মখমলের চাদর মনে হচ্ছে চুলগুলোকে ; ওর মুখখানাকে মনে হচ্ছে কালো মেঘের ফাঁকে চাঁদ। রাজকন্যার জ্ঞান নেই। ছোটরানী, দাস-দাসী, পরিচারিকা সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর সেবাযত্ন করছে। সকলেই চোখ মুছছে আর সেবা করছে। কেউ পালঙ্কের পাখা দিয়ে হাওয়া করছে, কেউবা কপালে দিচ্ছে জুঁই ফুলের জলে ভেজানো ঠাণ্ডা পটি। চোখ পদ্ম-মধুর নির্যাস দিয়ে মুছে নিচ্ছে কেউ।

ছোটরানী মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; ঘন চুলে মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটছেন। দু-জন সখী রাজকন্যার গোলাপী পদ্মের মতন পায়ে হাত ঘষে গরম করছে ; দুজন সোনার পদ্মের মতন হাতে হাত ঘষছে। সন্ধ্যে হব-হব। সমস্ত রাজপুরী প্রায় অন্ধকার। টিম-টিম করে দূরে দূরে দু একটা আলো জ্বলছে। আজ রাজসভায়, প্রাসাদের বাইরে আলোকসজ্জা হয়নি। কি করে হবে ? সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে যে !

সারা দেশে যে সব ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির বাইরে খেলা করছিল, তারা আকাশের দিকে তাকাল। ফুটফুটে আকাশে তারা ফুটছে। একটা-দুটো—ঐ তিনটে—!

তারা সুর করে ছড়া কাটতে লাগল—

একটি তারা
দিচ্ছে তাড়া—
দুটি তারা,
থমকে দাঁড়া।
তিনটি তারা রাঙায় চোখ,
চারটি তারা, ঘরে ঢোক !!

চারটে তারা দেখেই ছেলেমেয়েরা সুড়সুড় করে ঘরে যেতে আরম্ভ

করল। ঐটেই নিয়ম। দু-একটা দস্যি ডানপিটে ছেলে শুধু যেতে চাইল না। তারা একটু বড়, বন্ধুদের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ রঙ্গ-রসিকতা করবে, গল্পগুজব করবে। বাবা-কাকার ধমক না শোনা পর্যন্ত ঘরে যাবে না—পিদিমের আলোর ধারে পুঁথি খুলে বসবে না।

ওদিকে আকাশে তারা ফুটল আর এদিকে রাজকন্যার মুখের আকাশে দুটি তারা উঠল। রাজকন্যা দু-চোখ মেলে তাকাল। আহা! যেন বাগানে সন্ধ্যেবেলায় গন্ধরাজ ফুল ফুটল। সকলের দৃষ্টি মৌমাছির ঝাঁকের মতন রাজকন্যার চোখের ওপর আছড়ে পড়ল ; মায়া-মমতায় ভরা সব চাউনি।

ছোটরানী আকুল হয়ে ডাকলেন—মা, মাগো! লক্ষ্মী সোনা মা! কি কষ্ট হচ্ছে তোমার? আমাকে বলবে না মা-মণি?

ভাল করে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল ম দীপা। সবাই ওকে ধরে রাখল।

—বন্দীরা? ওরা কোথায়? ওদের কি হল? রাজকন্যা আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

কি বলছ, মা? এই যে, আমরা! তোমার মা! ছোটরানী মাথায় কপালে নরম করে হাত বোলাতে লাগলেন।

—বন্দীরা? কোথায় পাঠাল ওদের? আবার বলল রাজকন্যা।

—ওদের অন্য কোনো ক্ষতি করেনি। তোমার জন্যই কিছু করতে পারেনি—লক্ষ্মী। ধূম্রকূট পাহাড়ের লোহার দুর্গে বন্দী করে রাখার আদেশ হয়েছে। ওদের সেখানে নিয়ে গেছে।

রাজকন্যার প্রিয় সখী কাকলি বলল—সখী, তুমি ইন্দ্রজাল দেখিয়েছ। তোমার কথা শুনে প্রজারা এমন হইহই করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল যে, মহারাজ প্রাণদণ্ড দিতে পারলেন না। যাবজ্জীবন বন্দী। প্রাণে তো বাঁচানো গেল এখন।

দ্বিতীয়া সহচরী বর্ণালী বলল—প্রজারা সবাই তোমাকেই সুবর্ণভূমির

রানী বলে ঘোষণা করল। তোমার পায়ের ধুলো নেবার জন্য সে কি কাড়াকাড়ি। দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার করল রাজসভায়।

তোমার জন্যে কত লোক যে প্রাণ দিল, কত লোক যে আহত হল, তার লেখা-জোখা নেই। তবু সবাই মরতে-মরতে মার খেতে-খেতে তোমার জয়ধ্বনি বন্ধ করেনি।

রাজকন্যা ধড়মড় করে উঠে পড়ল।—তাদের শুশ্রূষার কি ব্যবস্থা হয়েছে? আহা, নিরীহ সাধারণ মানুষদের এমন করে মারে? আমি যাব! ওদের দেখব। আমাকে ধর। নিয়ে চল! রাজকন্যা পাগলের মতন টলতে টলতে এগিয়ে যেতে চাইল।

ওরা সবাই মিলে ওকে ধরে ফেলল। ছোটরানী ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি এখন সুস্থ নও যে মা-মণি। আমরা দেখছি! তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ, তারপরে সব জানবে। যা তো কাকলি, বর্ণালী, স্বর্ণালী—তোরা সমস্ত খবর নিয়ে আয় তো মা! আর শঙ্খমালা তুই রাজবৈদ্যকে মা-মণির খবরটা দিয়ে আয়। চারজন সখী দৌড়ল। বাকিরা রাজকন্যাকে ঘিরে রইল।

রাজবৈদ্য অতি বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে

এলেন ব্যস্ত হয়ে। তিনি রাজকন্যার মহলের পাশেই উদ্যানে থাকেন। তাঁর ঘন শাদা দাড়ি বুক ছাড়িয়ে নেমে এসেছে, মাথায় ঢেউ

খেলানো পশমের মতন শাদা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে গেছে। টুকটুকে পাকা আপেলের মতন তাঁর গায়ের রঙ। দেখলে মনে হবে স্বয়ং নারদ মুনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। তোমরা ছেলেবেলায় ছড়া শুনেছ—টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল, ঠাকুর দাদার শুকনো গাল। কিন্তু একে দেখলে বলবে—ও ছড়া এঁর কাছে খাটবে না, খাটবে না। মিথ্যে হয়ে যাবে। এমন সুন্দর এই বৃদ্ধ।

তিনি এসেই বললেন—রাজ্যের লক্ষ্মী বিষণ্ণা হলে সুবর্ণ কি আর সুবর্ণদ্বীপ থাকে মা? জলে ফলে শস্য, মানুষের মুখের আনন্দের হাসিতে কি আর ঝলমল করে দেশটা। সব যে শুকনো হয়ে গেল মা। বল আমাকে তোমার কোথায় দুঃখ, কেন দুঃখ? সেটাই আসল ব্যাধি। আমি তা সারিয়ে দেব।

রাজকন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন তিনি।

রাজকন্যার চোখ ছলছল করে উঠল, মেঘ জমল চোখে। কয়েক ফোঁটা মুক্তো জমল চোখে, মুক্তোগুলো বড় হতে লাগল,—গলতে লাগল—তারপরে গলা মুক্তো ঝর ঝর করে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ছোটরানীর চোখেও তাই। বৈদ্যশাস্ত্রীর চোখও শুকনো রইল না। যেন মৌসুমী বায়ু এসেছে এদের চোখে; রাজকন্যার সখীদের মুখ থেকেও মৌসুমী বায়ুর ফোঁস ফোঁস শব্দ আসছে ভেসে।

—বল মা! আমার কাছে কোন সংকোচ কোরো না! আমি আর এ পৃথিবীতে ক-দিন! যদি তোমার আর রাজ্যের মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটাতে পরি তবেই শেষ দিনগুলোকে সার্থক মনে করব। তার জন্যে যদি আমাকে জীবন দিতে হয় তো দেব। কয়েকটা দিন আগেই না হয় সকলের কল্যাণের জন্যে, জীবনটাকে দিয়ে দিলাম। জীবনের লক্ষ্য তো তাই হওয়া উচিত মা। তুমি বল মা!

—শুধু আপনাকেই বলব, আর জানবে আমার মা-মণি। যেন

করুণ সুরের গান. শোনা গেল। তা নয়, রাজকন্যা কথা বললে এতক্ষণে।

সখীরা আর পরিচারিকারা ছোটরানীর ইশারায় ঘর ছেড়ে চলে গেল সবাই। ঘরে শুধু তিনজন—রাজকন্যা, ছোটরানী আর রাজবৈদ্য। রাজবৈদ্য রাজকন্যার মুখের কাছে বসেছেন, পেছনে মাথার কাছে ছোটরানী। রাজকন্যা বলল—আগে বলুন, আহত প্রজাদের সেবাশুশ্রূষা চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হয়েছে?

—রাজার পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। শুধুমাত্র তোমার চিকিৎসার জন্য আমার কাছে সংবাদ গেছে। রাজা নিজে তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন। আমি কিন্তু রাজার আচরণে খুব ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছি। এসে দেখি, রাজসভার চারদিকে বাইরে প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্যন্ত আহত প্রজারা পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় 'চৎকার করছে। আর প্রহরীরা তাদের জন্যে কিছু করা তো দূরের কথা, ধমক দিয়ে তাদের বাইরে চলে যেতে বলছে। দেখে আমি নিজেই কিছু গুরুতর আহত প্রজার শুশ্রূষা করেছি, সেবাব্রতীদের ডেকে সেবাযত্ন ও চিকিৎসা করতে বলে এসেছি। শুধু তোমার অসুখের কথা শুনে এসেছি, দিদিমণি। দেশের লক্ষ্মী সুস্থ থাকলে সবাই সুস্থ হবে। আমার এখন মাথার ঠিক নেই, রেগে টং হয়ে আছি। কি বলতে কি বলব, কাজেই যা বলি চুপচাপ শুনবে, লক্ষ্মী দিদি আমার।—

—দাদুভাই, না রাগলে, ক্ষুব্ধ না হলে কি অসুস্থ হতাম? আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশি আহত, কাজেই আমিও যা বলব আপনাকে শুনতে হবে! তবেই আপনার কথাও শুনব।

রাজবৈদ্য এবার হেসে ফেললেন হাঃ—হাঃ করে। বেশ, তাই বল্। বল্ দিদিমণি, তোর কথাই আগে শুনব। এখন যা দিনকাল, মেয়েদের কথা শুনতেই হবে। বল্। কিন্তু না, ওঠা চলবে না। শুয়ে-শুয়েই বল্!

—যাদের জন্যে এত কাণ্ড, সেই বন্দীদের কথা বলছি। তাদের

নামে মিথ্যে রাজদ্রোহের, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনেই তাদের যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে। তার উপর শুনলাম তাদের খুব মারধোর করা হয়েছে, অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে তাদের উপর। তারা সবাই অল্প বিস্তর আহত। তাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা না হলে আমি আমার চিকিৎসা করতে দেব না। কোনো শুশ্রূষাও নেব না। এই প্রতিজ্ঞাটুকু যাতে থাকে তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তোমাকে !

কিন্তু তাদের তো ধূম্রকুট পাহাড়ের লৌহ কারাগারে বন্দী করে রেখেছে রে দিদি। সে বড় দুর্গম জায়গা। আমাকে যেতে দেবে না রে সেখানে। তাছাড়া যেতে পারবেও না।

—একটা ব্যবস্থা যে করতেই হয়ে দাদুভাই।

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলেন বৈদ্যশাস্ত্রী। বললেন—ঠিক হয়েছে, এতক্ষণ মনেই পড়ছিল না। যেন সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য, সেরা ছাত্র প্রধান সহকারী বৈদ্যশ্রী পুণ্যব্রত তো রয়েছে। সে তো এখন সৈন্য বিভাগের খ্যাতিমান বৈদ্য। তাকে দিয়ে তো কাজ হতে পারে। বেশ দিদিভাই—কথা দিচ্ছি, আজই আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। তুমি এখন এই ওষুধটি খাও।

উনি একটি পাত্র থেকে একটা তরল ওষুধ রাজকন্যার মুখের কাছে ধরলেন। রাজকন্যা হাসি-হাসি মুখে ছোটরানীর দিকে তাকালেন। ছোটরানী মৃদু হেসে বললেন—খাও মা। রাজকন্যা চোখ বুজে ওষুধটা খেয়ে নিয়ে, আঃ, বলে শান্তি-স্বস্তির একটা শব্দ করল। তারপর বলল—ওদের সংবাদ তুমি কখন আমাকে দেবে দাদুভাই ? কাল দুপুরের মধ্যেই তুমি ওদের সংবাদ পাবে দিদু।—

রাজকন্যা আরামে চোখ বুজল।

ওর মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে, আরো কিছু ওষুধ রেখে ছোটরানীকে ওর সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ দিয়ে রাজবৈদ্য বললেন—মা, আসি

তাহলে। তুমি ভাগ্যবতী মা, এমন গুণের মেয়ে তোমার! মাগো, তুমি রত্নগর্ভা, সার্থক মা!

ছোটরানী রাজবৈদ্যকে প্রণাম করলেন। উনিও আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

সখীরা সবাই ঘরে এল। এল পরিচারিকারা কিছুক্ষণ পরে অনেক পদশব্দ শোনা গেল রাজকন্যার মহলে। প্রধান প্রতিহারী এসে বলল—রানীমা। রাজকুমাররা তাঁদের আদরের বোনকে দেখতে এসেছেন।

—আসতে বল।—ছোটরানী বললেন।

রাজকন্যা তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল—ওরা কেন মা? আবার কি কুমন্ত্রণা আঁটছে? নিশ্চয়ই কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে ওদের।

—যাই থাকুক, কিছু করার তো নেই মা, এখন দেখই না। ছোটরানী বললেন—তুমি শুয়ে থাক, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

পদশব্দগুলো এগিয়ে এল। অনেকগুলো পদশব্দ থেমে গেলে দু'জনের পদশব্দ এগিয়ে এল রাজকন্যার বিশ্রাম-কক্ষের দিকে। খুব কাছে এসে যেন থমকে গেল। বাইরে থেকে ডাক এল—ছোট-মা!

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা।

—এস বাবা, এস, ছোটরানী ডাকলেন।

মকরকুমার আর কুবেরজিৎ ঘরে ঢুকল, ওদের গায়ে যুদ্ধের পোশাক।

—বোনটি কেমন আছে, ছোট-মা? কুবেরজিৎ জিজ্ঞেস করল।

মকরকুমার এগিয়ে এসে বলল—ঐ তো চোখ পিটপিট করছে, দেখি। ভাল আছিস তো মণি?

—কি কাণ্ডটাই বাধালি বলতো? মহারাজ সেই যে ঘরে ঢুকেছেন এখনো পর্যন্ত বেরোন নি। কারুকে ঢুকতেও দেননি। আমরা বাইরে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে এলাম। রাজ্যের চারদিক থেকে নানান দুঃসংবাদ আসছে। প্রধান সেনাপতি আর প্রধান মন্ত্রী কি করবেন জানতে চাইছেন, আদেশ চাইছেন। মহারাজ একটি শব্দও করছেন না। শেষে বাধ্য হয়ে আমরাই রাজ্যের কাজ চালাচ্ছি। বললে, কুবেরজিৎ।

রাজকন্যা উঠে বসল। বলল— বড়মা, মেজমা বাবার ঘরে যাননি? অন্তঃপুরের সহচরী পরিচারিকারা?

—হ্যাঁ, ওরা অনেক কষ্টে গেছে। কিন্তু বাবা কথা বলছেন না। উনি ভীষণ অপমানিত হয়েছেন। এরপর আর রাজত্ব করবেন না। সন্ন্যাস নেবেন স্থির করেছেন।

রাজকন্যা বড় বড় চোখ তুলে মকরকুমারের দিকে তাকালেন—এই বললে উনি কথা বলছেন না। তাহলে এত কথা বললেন কি করে?

থতমত খেয়ে মকরকুমার বলল—রেগে অন্তঃপুরে যাবার পথে আর ঘরে ঢোকার সময়ে ঐ সব কথা বলে উনি কথা বন্ধ করেছেন। উনি বলেছেন যে, কোনমুখে উনি আর রাজসভায় বসবেন? দেশে-বিদেশে তাঁর মান সম্মান কিছুই রইল না। প্রজাদের কাছে খেলো হয়ে গেলেন। রাগে দুঃখে অপমানে আর তোমার ওপর অভিমানে উনি সব ছেড়ে দিলেন।

শুনে রাজকন্যার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তার দুঃখ দেখে মকরকুমার আর কুবেরজিতের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল।

কুবেরজিৎ বলল—আমাদের কি কিছুই করার নেই বোনটি? অমন দেবতার মতন বাবা আমাদের। তিনি জঙ্গলে চলে যাবেন? মায়েদের কি হবে? আমাদের সোনার সংসার, এত আনন্দ, হাসি, গান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব ভেঙেচুরে ধুলো হয়ে যাবে। ভেবে দেখেছ? কে কোথায় থাকব এরপর? যে বাবা আমাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে স্বর্গমর্ত্য করেন, তাঁকে সুখী করতে পারব না আমরা?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজকন্যা বলল—আমি কি করতে পারি দাদাভাই? বলো, আমার জীবনটাকে দিয়ে দিলে যদি তাঁর সব

অপমান ধুয়ে মুছে যায়, আমি তাই দেব। বরং আমিই বনে চলে যাই, তোমরা সুখে থাক। আমি বোধহয় রাজকন্যা হবার যোগ্য নই।

বলে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল রাজকন্যা। তার কান্না দেখে রাজকুমাররা আষাঢ় মাসের মুষলধারে বৃষ্টির মতন কান্নার বন্যা বইয়ে দিল।

রাজকন্যার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে কত না বোঝাল, কত না সান্ত্বনা দিল।

শেষে মকরকুমার বলল—বুঝেছি বোন, তোর মনের কথা। বাবাকে গিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা। যা হয়েছে তার জন্যে তোর দুঃখের অন্ত নেই—এই কথাটাই উনি যেন শুনতে চান। তুই কোথায় যাবি? তুই যে আমাদের সকলের নয়নের মণি।

—আমরা যাচ্ছি। কুবেরজিৎ বলল—দুঃখ করিস নি। যা হয়ে গেছে সব ভুলে যা। বাবাকে ভুলিয়ে দে। আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। মাথায় হাত বুলিয়ে কুবেরজিৎ মকরকুমারকে যাবার ইঙ্গিত করল। মকরকুমার ওকে কি যেন ইশারা করল, কুবেরজিৎ লক্ষ্য করল না, বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই বাইরে থেকে আবার ফিরে এল মকরকুমারের কি কথা শুনে। এসেই বলল—আর শোন বোনটি, তোমার প্রাসাদের চারধারে নতুন করে সহস্র প্রহরী, দুর্জয় সেনা-বাহিনীকে রাখা হয়েছে, ওরা প্রাসাদের চারধার, প্রতিটি দোর-জানলা, প্রতিটি বেরোবার পথ পাহারা দিচ্ছে। তুমি যেন কিছু মনে কোরো না। গুপ্তচর বিভাগ খবর দিয়েছে, রাজার ওপর আক্রোশে, একদল দুর্ধর্ষ পাহাড়ী দস্যুদল তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার ফন্দী করেছে। তাই তোমাকে নিরাপদে শান্তিতে রাখার এই ব্যবস্থা। ছোটমা, ছোটমাগো। তুমিও ওর কাছে থাকবে সব সময়। ওকে ছেড়ে যেও না। অপরাধ নিও না মা। রাজকার্য বড়ই জটিল, বড়ই গোলমেলে. ভারী নির্মম আর নিষ্ঠুর। কান্নায় খান খান হয়ে ভেঙে পড়তে পড়তে মুকুট খুলে হাতে নিয়ে আবার বলল—ভগ্নীস্নেহ, মাতৃভক্তি প্রভৃতি মানুষের সব

পরম গুণগুলোকে জলাঞ্জলি দিতে হয় রাজকার্যের জন্যে, সব ধুলোয় লুটোয়, ভাল লাগে না। বলতে বলতে চুল এলোমেলো করে বেরিয়ে গেল কুবেরজিৎ। ওরা চলে গেলে ছোটরানী আর রাজকন্যা দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল।

—মামণি, কিছু বুঝলে?

—কি রকম যেন! ওদের ব্যবহারটা রহস্যময়। ছোটরানী বললেন।

এমন সময়ে সহচরী কাকলি বাইরে থেকে ঘুরে এসে বলল—সখী, বুঝেছ কিছু?

—মনে হচ্ছে আমরা বন্দী হলাম।

—হ্যাঁ, দেখে এলাম সমস্ত দ্বারপথে, গবাক্ষের সামনে, বাতায়নে, অলিন্দে, প্রাসাদ ঘিরে দৈত্যের মতন সব সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। প্রাসাদের চারদিকে সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে—।

রাজকন্যা বাঁস ফুলের মতন হেসে বলল—দেহটাকেই বন্দী করা যায়। প্রাণটাকে, মনটাকে কেউ কি বন্দী করতে পারে সখী? দেখ, ওদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

—কিন্তু ছোটমা, সখী, আমি আর একটা ব্যাপারের কথা ভেবে অস্থির হচ্ছি! বর্ণালী বলল।

কি রে বর্ণালী?

ছোটরানী ভালমানুষ, পাঁচপোঁচ বোঝেন না, তাকিয়ে রইলেন বর্ণালীর দিকে।

—আজ থেকে কুমীর-হাঙরের রাজত্ব শুরু হল। কুমীরকুমার আর হাঙরকুমারই দেশের হর্তাকর্তা-বিধাতা! দেখ, এই বলে দিলাম। এবার চলবে হিংসার, মানুষ খাওয়ার রাজত্ব।

—রাজাধিরাজ রাজত্ব ত্যাগ করেছেন, তাহলে আমি আর রানী নই। ছোটরানী নিশ্বাস ফেলে বললেন।

—মামণি, রাজাধিরাজ থাকলেও আমার জন্যে তুমি আর রানী

থাকবে না। রানী হতে চেও না মা! দেশের মানুষ যেখানে অপমানিত, সেখানে রানী না থাকাই পুণ্য। দেশের মানুষ যাকে রানী বলে মাথায় তুলে নেবে, সেই প্রকৃত রানী। তার ওপর ওদের ভাষায় রাষ্ট্র—রাজদ্রোহিণীর মা! রানী হবার বিলাস তোমার সাজে না মামণি!

—না রে, আমি তা বলছি না! হাজার হোক রাজাধিরাজ আমার স্বামী! তাছাড়া আমরা ঐভাবেই বড় হয়েছি, ভেবেছি, হঠাৎ মুছে ফেলি কি করে বল?

রাজকন্যা উঠে গবাক্ষপথের, দ্বারপথের, অলিন্দের বাইরে সুসজ্জিত সৈন্যদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। দূরে বাইরে ঘোড়ায়-চড়া সৈন্যদল খট্-খট্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনল। একবার উত্তর-পশ্চিম দিকের পাহাড়ের অন্ধকারের গভীরে তাকাতে চেষ্টা করল। তারপরে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল—তাহলে মামণি, বর্ণালী, কাকলি, শঙ্খমালা, মেঘমালা, এবার নতুন পালা এবার বন্দীশালা। রাজকন্যা, রাজরানী এবার হবে চাকরানী! এতই কি সোজা? রাজ্যে মানুষ নেই, প্রকৃতির ন্যায়বিচার নেই—?

সাত

এদিকে রাজামশাই তাঁর বিরাম-ঘরে খাটে শুয়ে আছেন। সেকি যে সে খাট। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি, তার ওপর সোনার পাত দিয়ে মোড়া। সোনার ওপর আবার হীরে, চুনি, পান্না, মুক্তো—নানা রঙের দামী দামী পাথর বসানো। তা থেকে রঙবেরঙের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। একটু আলো জ্বাললেই মনে হয় ঘরে হাজারখানেক রঙীন আলো জ্বলছে। ঘরে একটু সূর্যের আলো এসে পড়লে মনে হয় সাত রঙের সাতটা সূর্যের ঘুম ভেঙেছে ঘরের মধ্যে।

সেইসব হীরে জহরতের আলোয় রাজাকে কেমন দেখায়? মনে হয় যে মানুষ নন তিনি। তাঁর চারদিক থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে যেন। রাজার মাথার কাছে বসে বড়রানী তাঁর মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। মেজরানী ও দশ-বিশজন সহচরী খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেউ পাখার বাতাস করছে, কেউ ওষুধ আনছে, কেউ পথ্য আনছে—ফলের দুধ, দই, ঘোল, ডাবের জল সব থরে থরে সাজানো হচ্ছে। কেউ আনছে সুগন্ধী। ঘরে ভুরভুর সুগন্ধীর আর ফলের গন্ধ উঠছে।

এমন সময়ে মকরকুমার আর কুবেরজিৎ এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কুবেরজিৎ বলল—বাপীসোনা, এখন কেমন আছ?

ধনপতি রাজা ওর দিকে তাকালেন। মকরকুমার তখন বলল—বাপীসোনা, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আমাদের আদরের বোন মণিদীপা কি যে অনুতপ্ত হয়েছে বলে বোঝানো যাবে না, মনের দুঃখের আগুনে পুড়ে তার রঙ ছাইয়ের মতন হয়ে গেছে। আমরা যা বলব সে তাই করতে রাজী হয়েছে। আর বাপি, গুপ্তচর প্রধানের মুখে খবর পেলুম—রাজ্যের একদল দুর্ধর্ষ পাহাড়ী ডাকাত আমাদের আদরের বোনকে চুরি করে লুকিয়ে রাখার ফন্দী করেছে। তাই তার প্রাসাদে

দিনরাত কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছি। এক হাজার অশ্বারোহী, এক হাজার পদাতিক আর এক হাজার গুপ্তচর-সৈনিক, তিনজন সেনাপতির অধীনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রাসাদের চারদিকে সব সময়ে চরকির মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাছিটি পর্যন্ত তাদের এড়িয়ে আমাদের প্রিয় মণিদীপার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না।

ওখান দিয়ে প্রাসাদের কেউ বেরুতেও পারবে না। শুধু অতিবৃদ্ধ রাজবৈদ্যশাস্ত্রীকে রাজকন্যার প্রাসাদে চিকিৎসার জন্যে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এবার রাজার চোখের চাউনিতে ভাষা ফুটে উঠল। মনে হল যেন তাঁর মনের মধ্যে থেকে একটা খুশির ঝর্ণার মুখ খুলে দিল কে।

বললেন—তোমরা যা ভাল বোঝ কর। এখন আমার বিশ্রাম। নীলমুকুট পাহাড়ের পশ্চিম দিকে স্ফটিক সমুদ্রের ধারের বিশ্রামশালায় একটা শুভদিন দেখে আমার যাত্রার ব্যবস্থা কর। আমার হয়ে তোমরা দু'জনে রাজ্য চালাবে, আমি ঘোষণাপত্রে সই করে যাব।

—মহারাজ, আমরা ? আমরা যাব ? রানীরা বললেন।

—না, তোমরা রাজার মা হয়ে ঐশ্বর্য ভোগ করবে, ছেলেদের দেখবে। আর শোন অতিথি রাজা আর রাজপুত্রদের ভাল করে সেবাযত্ন করছ তো ?

—হ্যাঁ, মহারাজ। কুবেরজিৎ বলল।

—ওঁদের আদর-যত্ন করে নিজের নিজের রাজ্যে ফেরার ব্যবস্থা করে দাও। কাল সকালে ওঁদের সঙ্গে আমি দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেব।

রাজা নিশ্বেস ফেলে চোখ বুজলেন। রাজকুমাররা প্রণাম করে চলে গেল।

মৃদুমন্দ সুরে বাঁশি বেজে উঠল বাইরে। ঘুমপাড়ানিয়া বাঁশি। রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন।

একটু পরেই রাজা ছটফট করে উঠলেন ঘুমের মধ্যেই। রানীরা,

সহচরীরা দেখে অবাক। রাজার মুখের চেহারা ক্ষণে-ক্ষণেই পাল্টে যাচ্ছে। নানা রকম মুখভঙ্গী করছেন রাজা। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছেন, যেন দারুণ দুঃখে কষ্টে ভেঙে পড়ছেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়লেন। হঠাৎ আবার মুখচোখ কঠিন হল—রাজা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন।

রানীরা তাঁর সেবা করছিলেন, তাঁরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার কি হয়েছে মহারাজ? আপনি অমন করছেন কেন?

রাজা উঠে বসে ভাল করে চোখ রগড়ে চারদিকে তাকালেন। বললেন—স্বপ্ন। স্বপ্ন তাহলে। কিন্তু কি ভয়ংকর স্বপ্ন।

—কি স্বপ্ন মহারাজ? বড়রানী বললেন—কি এমন স্বপ্ন মহারাজ? সারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা রাজচক্রবর্তী যার জন্যে ভয়ে কুঁকড়ে যান?

—সে এক ভীষণ স্বপ্ন। আঃ। আমি যেন দেখলাম—উত্তরে পাহাড়ের দিক থেকে একটা বিরাট কালো মেঘ এসে দারুণ ঘূর্ণি ঝড় আর বৃষ্টিতে আমার সমস্ত রাজত্বটাকে একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে। তারপর—তারপর হঠাৎ শুরু হল ভূমিকম্প। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল। ওপরের মাটি নিচে চলে যেতে লাগল ঘর বাড়ি ক্ষেত খামার সবকিছুকে নিয়ে, আর নিচে থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব মাটি পাথর ধাতু ওপরে উঠে আসতে লাগল। আমার সোনার খনি, হীরের খনি তলিয়ে গেল। তারপর—তারপর সেই মাটির ভেতর থেকে এক বিরাট পুরুষ উঠে বিকট শব্দে হাসতে লাগল। তার মাথা আকাশ ছুঁয়েছে, তার ঘন কালো, ঝাঁকড়া চুল যেন সেই মেঘ। আর—আর আমার সোনার রাজ্যটাকে দুহাতে উপড়ে নিয়ে সে খেলনার মতন ভেঙে টুকরো টুকরো করে আবার নতুন করে সাজাতে লাগল। উঃ, কি দুঃস্বপ্ন! কি তেষ্টা!! সহচরীরা সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা সুগন্ধী

জল তাঁর মুখে এনে ধরল। একটু জল খেয়ে সুস্থ হলেন যেন রাজা।

—তারপর? রানীরা চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে রইল।

—তারপর যন্ত্রণার চোটে আমার ঘুম ভেঙে গেল—আরও কি কি সব হল যেন—মনে পড়ছে না, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

—আপনি বিশ্রাম করুন মহারাজ—স্বপ্ন স্বপ্নই। রাণীরা ওঁকে ধরে শুইয়ে দিলেন। উনি নির্জীব, নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকলেন।

আট

সেইদিন গভীর রাতে রাজবৈদ্য যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী রাজধানীর প্রধান সেবাশ্রমে গিয়ে হঠাৎ হাজির হলেন। সেবাশ্রমটা সৈন্যবাহিনীর জন্য। সৈনিকদের চিকিৎসা হয় সেখানে, সেবা শুশ্রূষা হয়। গিয়ে দেখলেন সেবাশ্রম প্রায় ভর্তি। প্রজাদের মারধোর করতে কিছু সৈন্য বেশ মার খেয়ে আহত হয়েছে ; তাছাড়া কালভৈরবের জঙ্গলের অভিযানে গণদেবদের সঙ্গে লড়াইয়ে বহু সৈন্য ভীষণ আহত হয়েছিল—এছাড়া কয়েকজন রাজকুমারও আহত। তাঁদের সেবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে।

এই সেবাশ্রমের প্রধান বৈদ্য হলেন বৈদ্যশাস্ত্রীর পরম প্রিয় শিষ্য পুত্রতুল্য পুণ্যব্রত শাস্ত্রী।

পুণ্যব্রত একজন সৈন্যের ক্ষত ধোয়ানো, ওষুধ দেয়া প্রভৃতি দেখাশোনা করছিলেন। বৈদ্যশাস্ত্রী চুপিসাড়ে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে করে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। চমকে উঠে পুণ্যব্রত পেছন ফিরলেন।

হঠাৎ তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—কি সৌভাগ্য, গুরুদেব, আপনি। কোন আদেশ আছে ?

—এই তো আমায় প্রিয় শিষ্যের উপযুক্ত কাজ। খুব খুশী হলাম। ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন—তোমার ঘরে চল, কথা আছে।

—চলুন।

পুণ্যব্রত তাঁর গুরুকে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন। ঘরের কপাট বন্ধ করে দিয়ে গুরু ফিসফিস করে বললেন—এখানেই কাজ শেষ নয়। তোমাকে ধূম্রকূট পাহাড়ে যেতে হবে। সেখানকার বন্দীরাও ভীষণভাবে আহত, তাদের সারিয়ে তুলতে হবে। তারপর কানে কানে কয়েকটা কথা বললেন। বলার পরে আরও বললেন—দেখ, তুমি ছাড়া এইসব

কথা কেউ যেন না জানে। খুব সাবধানে যাবে। খুব বিশ্বাসী লোক ঠিক করবে। চেহারার মিল দেখে নেবে তাদের ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে বুঝিয়ে নেবে। স্বার্থত্যাগী দেশব্রতী, সেবাব্রতীদেরই শুধু নেবে। মনে রেখ এটা একটা চরম ধর্মের কাজ, পুণ্য কাজ, দেশের কাজ। পুণ্যব্রত ঘাড় নাড়লেন, বললেন—গুরুদেব, আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার শিষ্যদের মধ্যেই অনেকে আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। আপনার শিষ্যরা মানুষের জন্যে জীবনটাকে উৎসর্গ করেছে, এটাই তাদের ব্রত ধর্ম।

—আজ তোমরা যোগ্য হয়েছে দেখে খুব খুশী হলাম। তাহলে— ?

—হ্যাঁ গুরুদেব, আমি কাল ভোরেই ধূম্রকূট পাহাড়ে গিয়ে বন্দী-দের চিকিৎসা করব। পুণ্যব্রত বললেন।

তখন বৈদ্যশাস্ত্রী তাঁকে চুপিচুপি আরো অনেক কিছু বলে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে এলেন।

ভোর-রাত্তিরে সেবাশ্রম থেকে তিনটে ঘোড়া দৌড়ল খটাখট্—খটাখট্—খটাখট্। শেষ রাতের নৈঃশব্দ ভেঙে খান খান হয়ে যেতে
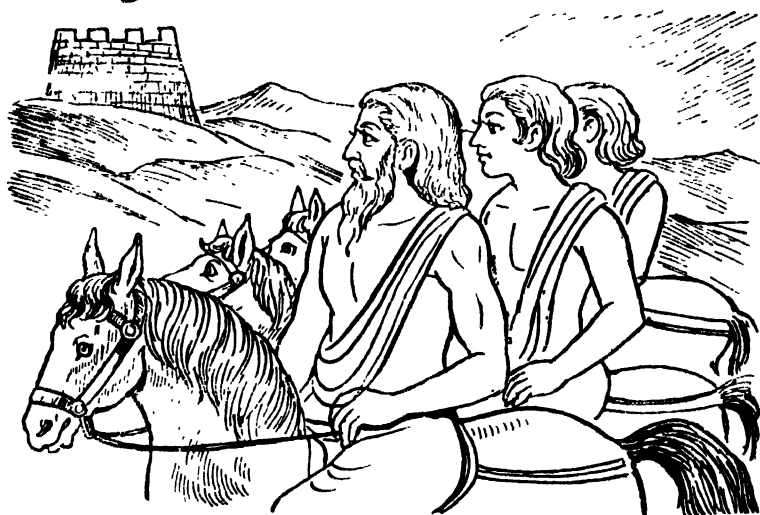
লাগল খপ্-খপ্—খপ্-খপ্—খটাখট্ শব্দে। পথের পাশের সাপগুলো,

বেজিগুলো, খরগোশগুলো সব ভয়ে জঙ্গলে ঢুকে যেতে লাগল। ইঁদুরগুলো গর্তে লুকোল। কুকুরগুলো দূর থেকে চীৎকার করে বিক্রম দেখাতে লাগল। ঝড়ের বেগে ছুটলকালো রঙের তিনটে ঘোড়া। পুব দিক থেকে ভোরের আলো পশ্চিম দিকে যেমন এগিয়ে যায়, সেইরকম গতিতে চলল ঘোড়াগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট দৈত্যের মতন ধূম্রকূট পাহাড় ওদের পথ আটকে দাঁড়াল। পাহাড়ের মাথাটা যেন আকাশ থেকে সূর্যটাকে পাকা আমের মতন পেড়ে নিয়ে মাথায় রেখেছে। পাহাড়ের মাথায় একবোঝা পাকা টুকটুকে আমের মতন আলো। এই পাহাড়ের মাথায় উঠলে যেন হাত দিয়ে আকাশটাকে ছোঁয়া যাবে। রাত্তিরে তারাগুলোকে নিয়ে যেন গুলি খেলতে পারা যাবে; আর মেঘগুলোকে গায়ে মেখে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেয়া যাবে যখন-তখন। সূর্যটাকে নিয়ে কিছু করা যাবে না - যা তাপ যা আগুন। তবে ওতে রঙমশালটাকে ধরিয়ে নেয়া যাবে, আতশ আর অন্য সব বাজির সলতেগুলোকে ধরিয়ে নেয়া যাবে কালীপুজোর সময়। দিনের বেলাতেই ধরাতে হবে। রাতে তো আর সূর্যকে পাওয়া যাবে না।

পাহাড়ের কাছে গিয়ে মনে হল আর বুঝি পথ নেই। তা কিন্তু নয়। একটা জঙ্গল পেরিয়ে একটা গর্তের মতন সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে গেলে ঘোড়াগুলো। দেখলে মনে হবে গর্তের মধ্যে চলে গেল ঘোড়াগুলো; তা কিন্তু নয়। গর্তের ভেতরে অন্ধকার পথ, ঐ পথ দিয়ে কিছুক্ষণ চললেই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে পাহাড়ের পথ পাওয়া যাবে। পথটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে। দু'পাশে নানা রকমের গাছ। ঐসব গাছ থেকে ওষুধ তৈরি হয়। পুণ্যব্রত তাঁর দুই শিষ্যকে গাছ চেনাতে চেনাতে চললেন।

পাথুরে পথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূর পাহাড়ের কোলে কোলে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। কিছুদূর পাহাড়ে উঠে আবার এক গর্ত, তার ভেতরে সুড়ঙ্গ-পথ। সেই পথের মুখে চারজন প্রহরী বল্লম

হাতে পাহারা দিচ্ছিল। তারা পথ আটকে দাঁড়াল। পুণ্যব্রত নিজের পরিচয়-পত্র দেখাতেই তারা পথ ছেড়ে দিল। এই রকমের বিশটা সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে ওঁরা অনেক উঁচুতে পাহাড়ের প্রথম চুড়োটায় পৌঁছে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মাটিটাই আকাশের মতন দূরে চলে গেছে—গাছপালা, পথঘাট, নদীনালা। আলাদা করে কিছুই বোঝা যায় না। ওপরে নীল আকাশ আর নিচে সবুজ আকাশ, শুধু এই রকম মনে হয়।

প্রথম চুড়োটায় সৈন্যাবাস কঠিন পাথরের ছোট ছোট বাড়ি। মাঝের বিরাট দুর্গটায় একজন সেনাপতি থাকেন। সেখানে গিয়ে পুণ্যব্রত ঘোড়া থেকে নামলেন। রক্ষীরা তাঁকে সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। তিনি ওঁকে দেখেই অভ্যর্থনা করে বসালেন। পুণ্যব্রত চিকিৎসার কথা বলতেই সেনাপতি একজন রক্ষীকে সঙ্গে দিয়ে দ্বিতীয় চুড়োয় পাঠিয়ে দিলেন। সেটা বন্দীশালা। চাপ চাপ পাথর দিয়ে গাঁথা গোল মতন উঁচু দেয়ালের বাড়ি। ছাদের কাছে ফোকর, ভেতরে অন্ধকার।

পুণ্যব্রত ভেতরে গিয়ে মশাল জ্বালতে বললেন। তারপরে বন্দীদের দেখলেন। সব বন্দীদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। উনি শেকল খুলিয়ে এক এক করে সকলের চিকিৎসা করলেন। ক্ষতগুলোয় নানান পাতার রস মেশানো প্রলেপ দিলেন। চিকিৎসার পরেই তাদের আবার শেকল পরিয়ে দেয়া হল।

পুণ্যব্রত গণদেবকে প্রলেপ দিতে দিতে চাপা গলায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। প্রবলকে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—কোন চিন্তা নেই, সবাইকে সারিয়ে দেব, তবে তিন সপ্তাহ ধরে চিকিৎসা করতে হবে। তিনদিন পরে আবার আমরা আসব, তৈরি থেক সব।

ওদের কি খেতে দেয়া হচ্ছে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, ফলমূল ছাড়া অন্য কিছুই প্রায় খেতে দেয়া হয়নি। উনি গন্ধরাজ চালের ভাত

ঘি কাঁচকলা সেদ্ধ, আর ছোলার ডাল খেতে দেবার নির্দেশ দিলেন। বন্দীরা শুনে খুব খুশি। ষোলোজন পুণ্যব্রতকে প্রণাম করল।

চিকিৎসার কাজ মিটিয়ে, সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে. নির্দেশাদির কথা বলে, আবার তিনদিন পরে এসে দেখার ইচ্ছে জানিয়ে, খাওয়া-দাওয়া করে পুণ্যব্রত তাঁর সঙ্গীদের দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা বৈদ্যশাস্ত্রীর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সূর্য তখন পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। ওঁরা বৈদ্যশাস্ত্রীকে সবকিছু জানিয়ে বিশ্রাম করতে গেলেন।

আর সন্ধ্যেবেলায় বৈদ্যশাস্ত্রী গেলেন রাজপ্রাসাদে রাজকন্যার মহলে। উনি যেতেই রক্ষীরা অভিবাদন করে দোর ছেড়ে দাঁড়াল। প্রথমে গজারোহী অশ্বারোহীরা সিংহদ্বার ছেড়ে দাঁড়াল, ভেতরের মাঠে রথীরা রথ সরিয়ে নিল, শেষে পদাতিক প্রহরীরা মহলের দোর ছেড়ে দাঁড়াল। বৈদ্যশাস্ত্রী ভেতরে ঢুকে যেতেই রাজকন্যার সহচরী চন্দ্রমুখী ওঁকে অভ্যর্থনা করে রাজকন্যার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ভোরের চাঁদের মতন ম্লানমুখে মণিদীপা জানলার পাশে বসে দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। বৈদ্যশাস্ত্রী ডাকলেন—মা লক্ষ্মী, আমি এসেছি। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রাজকন্যা।

—আজ তুমি কেমন আছ মা?

শুকনো গলায় মণিদীপা বলল—আজ বোধহয় একটু ভাল।

— এইবার আমার দিদু ভাল হয়ে উঠবে। সব রকমের চিকিৎসা হচ্ছে। শুভ-সংবাদ একটা ভাল চিকিৎসা, আজ তাই দিয়েই চিকিৎসা হবে, হাঃ—হাঃ—হাঃ—!

রাজকন্যা ব্যাকুল হয়ে আকুল চোখে বৈদ্যশাস্ত্রীর দিকে তাকাল। বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন—সব আহতদের সেবাশ্রমে সেবাশুশ্রূষা করে প্রায় সারিয়ে তোলা হয়েছে। তারা কাল থেকে যে যার গ্রামে ফিরে যেতে আরম্ভ করবে।

রাজকন্যা তবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে দেখে বৈদ্যশাস্ত্রী

হো হো করে হেসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি ওষুধ-পথ্য ঠিক ঠিক খেয়েছ তো দিহু ?

—হ্যাঁ দাহু। তবু যেন সুস্থ হচ্ছি না ?

—শোনো সোনা দিদি আমার প্রিয়তম শিষ্য পুণ্যব্রতকে ধূম্রকুট পাহাড়ে পাঠিয়েছিলুম !— এ কথা শুনে চমকে উঠল রাজকন্যা।

—আগে বোস, শান্ত হও। বৈদ্যশাস্ত্রী হেসে বললেন, আগে একটা প্রতিশ্রুতি দাও যে, ওখানকার সব ভাল খবর দিলে তুমি মনের আনন্দে থাকবে, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে যা করার করবে ?

—কথা দিলাম, গুরুদের।

ধূম্রকূট পাহাড়ের সব বন্দীদের চিকিৎসা করে এসেছে পুণ্যব্রত। তাদের ভাল পথ্যর ব্যবস্থা করে এসেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে, আগের মতই বল ফিরে পাবে।

—এবার একটু হাস দিহু।

—রাজকন্যা হেসে ফেলল।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন।

—কিন্তু আমি কি বন্দী নয় ? রাজকন্যা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, শুধু তুমি কেন, আমার মনে হয় তোমার বাবা রাজাধিরাজও অর্ধবন্দী, খুব শিগগির পূর্ণ-বন্দী হবেন। দুষ্ট মন্ত্রী মার্তণ্ডদেবের কথায় গুণধর রাজপুত্ররা চলছে এবং কুপথেই চলছে।

রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল ডেকে আনবে ওরা। হয়তো ভালই হবে। খুব অমঙ্গল ঘটলে তাকে পেরিয়ে তবেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হয়। দেশের সাধারণ মানুষেরা রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী সকলেরই ওপরে বিরূপ, সকলকেই তারা চিনে ফেলেছে। তাদের সব ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা তোমার ওপরই আশীর্বাদের মতন ঝরে পড়ছে।

রাজপুত্ররা তা সহ্য করবে না। তোমাকে সারা জীবন লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দিতে চায়। সাধারণ মানুষও রাজপুত্রদের সহ্য করবে না। একটা কিছু হবেই। রাজা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছেন। এখন দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

—তাহলে এখন কি হবে? রাজকন্যা জানতে চাইল।

বৈদ্যশাস্ত্রী—এখন কিছু জানতে চাসনি মাগো, সময় মত সব জানতে পারবি। ভাল হবে শুভ হবে।—

রাজকন্যা—আমি তাহলে সব অন্যায় মেনে নিয়ে চুপচাপ বন্দী জীবন কাটাব?

বৈদ্যশাস্ত্রী (রাজকন্যার নাড়ি দেখতে দেখতে)—ভেতরে ভেতরে তৈরি থাক মা। কিছুদিন চুপচাপ থাকাটাকে একটা কৌশল বলে মনে করে শান্ত হও। যখম সময় আসবে আমিই বলে দেব কি করবে। আমার শিষ্যরা সবাই পণ করেছে মানুষের রোগের সঙ্গে সঙ্গে দেশের রোগও সারাবে। এই সব অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, মানুষে মানুষে তফাত করা, বিভেদ সৃষ্টি করা, দুর্নীতি, সব দেশেরই রোগ। শুধু মানুষের রোগ সারালেই সব ঠিক হবে না, দেশের রোগও সারাতে হবে—তাহলেই সমাজ, সংসার, রাজ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস, কাজকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা ও আচার-আচরণ, মানুষের ইচ্ছে সব ভাল হবে, সব কিছু সুস্থ হয়ে উঠবে। না হলে সব গেল। সুবর্ণদ্বীপ ঐ সব রোগে পঙ্গু হয়েছে। এই সোনার দেশকে সুস্থ করার প্রতিজ্ঞা করেছে পুণ্যব্রত আর গণদেবের দল। তুইই প্রথমে পথ দেখিয়েছিস। তোর দেখেই ওরা সবাই জেগে উঠেছে। আর ভাবনা নেই। একটু সামলে যাক কিছুদিন।

বৈদ্যশাস্ত্রী মণিদীপার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মণিদীপার চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল সে।

এরপরে বৈদ্যশাস্ত্রী এলেন রাজার প্রাসাদে। তাঁকে দেখে সিংদরজার ঘোড়ায় চড়া প্রহরীরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। দরজা খুলে গেল। একটার পর একটা দরজা তিনি পেরোতে যান আর দু'পাশের প্রহরীরা তাদের বল্লম বা তলোয়ার মাটিতে নামিয়ে মাথা নিচু করে তাঁকে সম্মান জানায়, দরজা ছেড়ে দেয়। এইভাবে একুশটা দরজা পেরিয়ে তবে রাজার মহলের বাগানে এসে পড়েন তিনি। বাগানে হাজার হাজার নানা রঙের পাখি গান গাইছে। নীল জলের পুকুরে সাদা, কালো, সোনালী রাজহাঁসেরা সাঁতার কাটছে। নীল লাল, হলদে রঙের পদ্মের আলোয়, নানা ফুলের গন্ধে, বাগানটাকে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের নন্দনকানন। বৈদ্যশাস্ত্রী বাগান পেরিয়ে রাজার মহলে ঢুকতে গেলেন। ঐ মহলের দরজায় শুধু মাত্র মেয়ে প্রহরী, হাতে তাদের সরু সরু তলোয়ার আর বল্লম। দেখলে মনে হয় প্রত্যেক দরজায় মা দুর্গা দাঁড়িয়ে রয়েছেন যেন। তারাও অস্ত্র নামিয়ে দরজা ছেড়ে দিল। রাজার প্রধান প্রতিহারী সূর্যমুখী বৈদ্যশাস্ত্রীকে ভেতরে নিয়ে গেল।

হীরে চুনী পান্নার কাজ করা সোনার খাটে শুয়ে আছেন রাজা। বৈদ্যশাস্ত্রীকে দেখে মৃদু হাসলেন উনি।

—আজ কেমন আছেন মহারাজ? যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

—ভালই। তবে বড় দুর্বল। আমার মা লক্ষ্মী কেমন আছে বৈদ্যশাস্ত্রী?

লক্ষ্মীমা অনেকটা সুস্থ। তবে ঐ দুর্বল। কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। নড়াচড়া বন্ধ। দেখি আপনার হাত। বৈদ্যশাস্ত্রী নাড়ি দেখলেন, জিব দেখলেন, চোখের পাতা তুলে পরীক্ষা করলেন। সব করে-টরে বললেন, মহারাজ, কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, আপনার বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন। কিছুদিনের জন্যে দূরে কোথাও, সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ে থাকতে হবে। তিন মাস যদি সমুদ্রের

খোলা হাওয়ায় থেকে আমার ওষুধ খান তো আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন, দীর্ঘ সুস্থ নতুন জীবন পাবেন।

—আপনি অন্তর্যামী, আমার মনের কথাই বলেছেন। আমি নিজেই ঠিক করেছিলাম—নীলমুকুট পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে, স্ফটিক সমুদ্রের ধারে, আশ্রম-জীবন যাপন করব। আমি একাই যাব।

—খুব ভাল কথা। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে আপনাকে দেখে আসব। সঙ্গে এক শিষ্যকেও দেব। বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন। রাজা গম্ভীর স্বরে বললেন, কে আছ? মহামাত্য মার্তণ্ড সিংহ আর রাজপুত্রদের এখনি ডেকে নিয়ে এস। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং ঢং করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৌড়ে এল মকরকুমার আর কুবেরজিৎ, তার একটু পরেই এলেন প্রধান মন্ত্রী। ওঁরা বসলে রাজামশাই বললেন, কাল ভোরে রাজসভা ডাক। তোমাদের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে আমি কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম করতে যাব নীলমুকুট পাহাড়ের কোলে, স্ফটিক সমুদ্র ধারের আশ্রমে। তুমি মকরকুমার দেশ শাসনের ভার নেবে, কুবেরজিৎ দেশ রক্ষার দায়িত্ব নেবে। মহামন্ত্রী তোমাদের সব ব্যাপারেই পরামর্শ দেবেন। প্রতিজ্ঞা কর সুশাসন করবে।

রাজকুমারা রাজার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল—মহারাজ, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় আমরা প্রাণ পণ করলাম। সুশাসন করব, রাজ্যের সমৃদ্ধির, নিরাপত্তার দিকে সব সময়ে দৃষ্টি দেব।

রাজা বললেন, বেশ, কাল রাজসভায় আমি ঘোষণা করে তোমাদের হাতে দেশের দায়িত্ব ছেড়ে দেব।

তাই হল। পরের দিন সকালে রাজা রাজ্যভার ছেড়ে, বড়রানী মেজরানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, রাজকন্যা আর ছোটরানীর সঙ্গে দেখা না করে, রথে চড়ে নীলমুকুট পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলেন। রাজার সঙ্গে গেল একশো সেবক, আর এক হাজার সৈন্য সামন্ত।

রাজা চলে গেলে, কয়েক দিন ধরে উৎসবে মাতল সুবর্ণদ্বীপ, বিশেষ করে রাজধানী। কারণ কি, না রাজকুমাররা রাজ্যভার পেয়েছেন। তাঁদের অভিষেক উৎসব। সারা রাজ্যে আলো জ্বলল, বাজনা বাজল, শোভাযাত্রা বেরুল। নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়াদাওয়া সাতদিন ধরে চলল। সেই সব বিদেশী রাজপুত্ররা অনেকে থেকেই গেলেন উৎসবের জন্যে। যাঁরা চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে এলেন নেমন্তন্ন পেয়ে। এ রাজ্যে দলবল নিয়ে তাঁরা যা খুশি তাই করতে লাগলেন। অত লোক বাইরে থেকে এসে যদি খাওয়াদাওয়া, আমোদ-প্রমোদ করে, তাহলে দেশের খাবারদাবারে টান পড়বে না ?

তার ওপর ছুটি দিয়ে ছুটির কামনা বাড়িয়ে দিয়ে কাজকর্ম বন্ধ করানো হয়েছে। সবাই উৎসবে অতদিন ধরে মত্ত হলে কাজকর্ম হয় ? কাজকর্ম বন্ধ হলে জিনিসপত্র তৈরিও বন্ধ হয়। মাঠের ফসলের যত্ন না করলে ফসল নষ্ট হয়, ভাল হয় না। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হতে লাগল। জিনিসপত্র কম থাকায় দুষ্ট ব্যবসায়ীরা তা লুকিয়ে ফেলে অভাবের সৃষ্টি করল ; শেষে মানুষের কাছ থেকে গলাকাটা দাম নিতে লাগল। ঐ অবস্থায় দেশের লোককে কিন্তু খাজনাটা পুরো মাত্রাতেই দিতে হবে। ফসলের ভাগের বেশির ভাগটাই রাজার ভাঁড়ারে জমা দিতে হবে। তাহলে ? তাদের কি করে চলবে ? অর্ধেক দিন উপোস করতে হবে যে ! কে বোঝে, আর কেই বা বোঝায় ? রাজপুত্ররা সাতদিন উৎসব করেই থামল না। প্রধানমন্ত্রীর হাতে সব দায়িত্ব দিয়ে আমোদ-আহ্লাদ, মৃগয়া, নাচ-গান এই সবে মেতে রইল।

আমোদ-প্রমোদ আর অতিথি রাজাদের জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ হতে লাগল। আরো আরো টাকার দরকার হতে লাগল, তাই খাজ-নার টাকা আদায়ের হিড়িক পড়ে গেল। জোর করে খাজনার টাকা, শস্য আদায় হতে লাগল। বাসমতী গ্রামের ওপরে আগে থেকেই সব চেয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে, সবাই জানে। আগেই ঐ গ্রামের অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়েছিল। চাষীদের মারধোর করা হয়েছিল। গণদেবের

বিচারের সময় অনেক লোককে বন্দী করা হয়েছিল। ফলে চাষের আরো ক্ষতি হল। গ্রামের অর্ধেক লোকই তো হয় আহত না হয় বন্দী। গ্রামের লোকেরা রাজার ওপর ক্ষেপে ছিল। তাদের সোনার চাঁদ সব ছেলেদের বিনা দোষে বন্দী করে রেখেছে। তাদের ওপর অত্যাচার করেছে। গণদেবের বাবার কাছে গ্রামের সবাই হাজির হয়ে বলল, মোড়ল এ অত্যাচার আমরা সইব না। প্রতিকার চাই। আমরা খাজনা দেব না। ফসল তো দেবই না।

—ওরা যদি অত্যাচার করে? গণদেবের বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

—সবাই মিলে এক হয়ে লড়ব। বনে জঙ্গলে চলে যাব সেও ভাল। একজন মাতব্বর বলল।

—তবে তাই হোক! সকলেরই তাই মত।

বাসমতী গ্রাম খাজনা আর ফসল দেবে না ঘোষণা করল।

বাসমতী গ্রাম রাজ্যের সবচেয়ে বেশি ফসল ফলায়, খাজনা দেয়। ওদের দেখাদেখি আরো অনেক গ্রাম খাজনা ফসল বন্ধ করল। ঝাউ-গ্রামের খাজনা সামন্ত সিং নিজে হাতে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারও পেল সামন্ত সিং। সামন্ত সিংকে পূর্বাঞ্চলের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করা হল। দশ হাজার সৈন্য দিয়ে তাঁকে খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হল। সামন্ত সিং রাজপুত্রদের ওপরে যায়। সে সৈন্যদল নিয়ে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করে জোর করে খাজনা আদায় করতে লাগল। বাসমতী গ্রামের মানুষেরা এত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জঙ্গলে গিয়ে লুকোল। সেখানে তারা এক দুর্ধর্ষ দল গড়ে তুলল। বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। দিনে তারা লুকিয়ে থাকে, আর রাতে হঠাৎ ঝড়ের মতন এসে ঝাউগ্রামে লুঠপাট চালায়। খাবার-দাবার যা পায় নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যে কুশাসন চরমে উঠল। সব প্রজারা ক্ষেপে গেল। সবাই বলতে লাগল রাজপুত্রদের, মার্তণ্ডদেবের শাসন মানব না। রাজকন্যা

যদি সিংহাসনে বসে তবেই মানব, খাজনা দেব, প্রাণপণে রাজ্যের জন্যে খাটব।

রাজ্যের অবস্থা যত খারাপ হয় রাজপুত্ররা অত্যাচার ততই বাড়িয়ে দেয়। মার্তণ্ডদেবের কুমন্ত্রণায় রাজপুত্ররা এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠল যে, শেষকালে তারা রাজা ধনপতিকেও বন্দী করে রাখল স্ফটিক সমুদ্রের ধারের আশ্রমে। যেমন দুর্বুদ্ধি দিয়েছিলেন তিনি ছেলেদের! রাজ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু জানতেই দেয়া হল না তাঁকে। এদিকে রাজকন্যা সব শোনে আর কাঁদে, কাঁদে আর শোনে। তার অবস্থা বিবেচনা করে একদিন বৈদ্যশাস্ত্রী এসে বললেন, মা, এইবার সময় হয়েছে। এবার তুমি না উঠলে দেশটা রসাতলে যাবে!

—বলুন গুরুদেব, কি করব আমি? নিজের প্রাণটা দিলে যদি দেশটা বাঁচে তো তাই দেব। মানুষের দুঃখকষ্টের কথা আর শুনতে পারছি না আমি। ওদের সুখের জন্যেই তো রাজা রাজত্ব করবেন। এ-অন্যায় আমি সহ্য করতে পারব না।

বৈদ্যশাস্ত্রী—শোন মা, যদি সত্যিই দেশটাকে দুর্গতির হাত থেকে উদ্ধার করতে চাও তো উল্টো কথা বল, উল্টো গাও। মনের আসল কথাটা চেপে রাখ। কৌশল কর।

রাজকন্যা—কি কৌশল?

বৈদ্যশাস্ত্রী—রাজপুত্রদের ডেকে বলো তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ! এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও!

রাজকন্যা—সে কি? এ যে মিথ্যে—

বৈদ্যশাস্ত্রী—আসলে প্রায়শ্চিত্তই করবে! আমি বলে দেব! এখন ঐ কথাই বলো! আমাকে বিশ্বাস করো! সব ঠিক হয়ে যাবে। দেশ আবার সোনার পদ্মের মতন ফুটে উঠবে!

রাজকন্যা—তারপর?

বৈদ্যশাস্ত্রী—দেখই না ওরা কি বলে? তারপর কি করতে হবে সব বলে দেব!

তাই হল। বৈদ্যশাস্ত্রীর সামনে একটা বার্তা লিখে রাজকন্যা সহচরী চম্পাবতীর হাতে দিয়ে বললেন—কুমারদের হাতে নিয়ে গিয়ে দাও।

বার্তা পেয়েই মকরকুমার আর কুবেরজিৎ দৌড়ে এল। মনে মনে তারা দিশেহারা হয়ে উঠেছিল। দেশের লোক তাদের মর্কটকুমার আর কুমড়োজিৎ বলে ডাকে। ভাবল রাজকন্যাকে সামনে রেখে এবারে বোধ হয় সুখে রাজত্ব করা যাবে।

হাসিহাসি মুখে এসে বলল—বলো বোন, কি হয়েছে তোমার?

রাজকন্যা বলল- ভুল করেছি। প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। বন্দীদশা আর ভাল লাগে না।

ওরা হেসে গলে গিয়ে বলল—ঠিক কথা! তোমার কি এ জীবন ভাল লাগে। দাঁড়াও, মহামন্ত্রীকে ডাকি! সংবাদ পাঠাতেই মার্তণ্ড সিং এলেন। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে রাজকুমাররা বলল—সোনা বোন, তোমাকে একটিমাত্র কাজ করতে হবে! তোমার সঙ্গে আমরা লোক-লস্কর, রথ-পাল্কী, হাতি-ঘোড়া, একটা চলন্ত প্রাসাদ দিয়ে দেব। তুমি শুধু রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে গিয়ে কিছুদিন করে থেকে তাদের শান্ত করবে, বলবে তুমি ভুল করেছ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনে জনে বলবে—দোষ হয়েছে। এবার তুমিই দেশের শাসন ভার নেবে! কিন্তু শূন্য রাজকোষে তো শাসন চলে না। সবাই খাজনা শস্য দিক, আর দু' একটা বছর একটু ধৈর্য ধরে থাকুক, কষ্ট করুক। তারপর তুমি সব ঠিক করে দেবে। রাজ আদেশ মেনে চলতে বলবে সবাইকে। তারপরে আবার স্বয়ংবর সভায় গিয়ে তোমার বর বেছে নিতে হবে!—কি রাজী তো?

—কিন্তু অত ঘোরাঘুরি, অত পরিশ্রম কি সহ্য হবে ওর? বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন।

—কেন, চিকিৎসক দল নিয়ে আপনি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাবেন!

—যে আজ্ঞা ! বৈদ্যশাস্ত্রী রাজকন্যাকে চোখ টিপে ইশারা করে মেনে নিতে বললেন।

—আমি মত দিলাম। প্রতিটি গ্রামে যাব। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে কাজ করতে বলব। রাজকন্যা বলল।

—প্রথমেই যাবে বাসমতী গ্রামে। হরদেব মাঝিকে প্রথমে বোঝাবে। ঐ গ্রামটাকে শান্ত করতে পারলে সব গ্রাম আস্তে আস্তে শান্ত হবে ! কুবেরজিৎ বলল।

—তাই হবে। কিন্তু জোর করে খাজনা, শস্য আদায়, অত্যাচার বন্ধ করে দিতে হবে, আমি যাচ্ছি এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। আমি না পারলে তখন তোমাদের পথে তোমরা চলতে পার। রাজকন্যা বলল।

হ্যাঁ, সব বন্ধ থাকবে ছ'মাস। তুমি সৈন্য পাবে পাঁচ হাজার। মকরকুমার বলল।

—সৈন্যের দরকার নেই। অত লোক গ্রামে গেলে সব কিছুর ওপরই টান পড়বে। অত্যাচারই করা হবে। আমার সঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্রী আর কিছু লোকজন থাকলেই চলবে। প্রত্যেক গ্রামে আশ্রম করে থাকব আমি। সেখানে নিজেরা পরিশ্রম করব—ফসল ফলাব, ছোট ছোট শিল্পকাজ হবে। আমি চলে এলে সেবা, শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠবে। বাজে অর্থ নষ্ট হবে না। কোনো কোনো আশ্রম পরে সেবাশ্রম হবে। রাজকন্যা বলল। বৈদ্যশাস্ত্রী মুখ উজ্জ্বল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

—বেশ তাই হোক। শান্ত কর দেখি রাজ্যটাকে ! তারপর তোর বিয়ে দেব। তুহিনকুমার হিরণকুমারেরা তোর জন্যে সন্ন্যাসী হয়ে রয়েছে। —মকরকুমার আদর করে বলল।

তাই হল। রাজপুরুষেরা গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিল রাজকন্যা আসছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কোন গ্রামে কবে যাবেন, ক'দিন থাকবেন, তাও বলে দেয়া

হল। গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। একটা নতুন হাওয়া দিল যেন! সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাহলে কিছু একটা হবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত কেন? রাজকন্যা তো তাদের মাথার মণি।

তিনি তো কোন দোষ করেন নি। সবাই ঠিক করল যে প্রায়শ্চিত্ত তাকে কেউ করতে দেবে না। কোন শাস্তি তাঁকে কেউ নিতে দেবে না। গ্রামে গ্রামে ছেলেরা তৈরি হল, তারা রাজকন্যার জন্যে প্রাণ দেবে। শাস্তি যদি কিছু থাকে তো তারা নেবে।

উনি শুধু ওদের মাথার মুকুট হয়ে সুখে থাকুন।

ঐটেই শাস্তি, তাদের মুকুট হয়ে থাকতে হবে, আড়ালে চলে গেলে চলবে না।

শুভ বৈশাখী-পূর্ণিমার দিনে সকালে রাজকন্যা চন্দন-জলে স্নান করে লক্ষ্মীপুজো করে রথে চড়ল, সঙ্গে চলল তার দশজন সহচরী, বৈদ্যশাস্ত্রী আর তাঁর দশজন সহকারী, কিছু লোকজন মালপত্তর শিবির গোটা পাঁচেক রথ। পূব দিকে চললেন তাঁরা। বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন বাসমতী গ্রামে। ওদিকে বাসমতী গ্রামের লোকেরা হিরণ্যরেখা নদীর ধারে চাঁপা ধান ক্ষেতের পাশে এক সুন্দর আম জাম ঝাউ বাগানে একটা আশ্রম তৈরি করে রেখেছে।

সে তো রাজকন্যা নয়, গ্রামের লক্ষ্মী! ঠিক সন্ধ্যের সময়ে মণিদীপা বাসমতী গ্রামের সীমানায় পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল, ঘণ্টা কাঁসর বেজে উঠল, গ্রামে ঢোকার মুখে তোরণে তোরণে সানাই বেজে উঠল। দূরে দূরে মাদলের শব্দে গ্রাম উত্তাল হয়ে উঠল, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে উঠল। মনে হল যেন নতুন এক দীপান্বিতার রাত্তির। গ্রামের মেয়েরা আর ছেলেরা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে, শোভাযাত্রা করে, রাজকন্যাকে নিয়ে চলল। গ্রামসুদ্ধু লোকজন সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিল।

হিরণ্যরেখা নদীর জলে কত শত নৌকা করে লোক এসেছে কাতারে

কাতারে! নৌকায় নৌকায় আলো জ্বলছে, মাদল বাজছে, বাঁশি বাজছে। নদীর জলে পূর্ণিমার চাঁদ আচ্ছা এক নাচ নাচছে।

আশ্রমে পৌঁছে রাজকন্যা গণদেবের বাবাকে প্রণাম করে, কাছে বসিয়ে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। বৈদ্যশাস্ত্রীও কথায় যোগ দিলেন। তিনি একান্তে হরদেব মাঝিকে অনেক কিছু বোঝালেন। সব কথা শুনে রাজকন্যাকে মেয়ের মতন আদর করে উনি গ্রামবাসীদের বললেন—শোন মায়েরা, বোনেরা, মেয়েরা, ভায়েরা আমার—আমাদের লক্ষ্মী গ্রামে এক মাস থাকবেন। উনি কাল থেকে একটা ব্রত করবেন। ব্রতটা নতুন ধরনের—

উনি কোনো একটা ক্ষেতে নিজের হাতে বীজ বুনবেন, ধান রুইবেন। কোনো বাড়িতে গিয়ে ধান সেদ্ধ করবেন, পরে ধান ভানবেন, চাল কুটবেন, চিঁড়ে কুটবেন, কোনো বাড়িতে মুড়ি-ভাজবেন, খই ভাজবেন, কোনো বাড়িতে গিয়ে ফল-ফুলের গাছ লাগাবেন, পরে দক্ষিণের সোনা হীরের খনি থেকে ধাতু তুলে শোধনের কাজও করবেন। আসলে সাধারণ মানুষ যে সব কাজ করে দেশের সম্পদ ও শস্য তৈরি করে, উনি সেই সব কাজ নিজে হাতে করে সাধারণ মানুষের সমান হবার ব্রতটাকে উদযাপন করবেন। তোমরা সবাই মিলে ওঁকে সাহায্য কোর। দেখ, আমাদের মায়ের কোনো অসুবিধে, কোন কষ্ট যেন না হয় হে! সারা দেশ ঘুরে ঘুরে উনি এই কাজ করে দেশকে বাঁচিয়ে তুলবেন। আমাদের সুবর্ণদ্বীপ ভস্মদ্বীপ হয়ে গেছে, আবার সোনার দ্বীপ হয়ে উঠবে।

সবাই শুনছই!

সবাই বলল, হ্যাঁ মোড়ল!

ওঁর সঙ্গে কাজে লাগবে তো গিয়ে?

সবাই বলল, হ্যাঁ গো!—

পরদিন ভোর থেকে কাজ শুরু হল। বাসমতী গ্রামের যেন ঘুম ভাঙল অনেক দিনের পরে। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ জড় হল কালভৈরব

জঙ্গলের পুব দিকের সেই গন্ধরাজ ধানের ক্ষেতে। ঐ ক্ষেতের সব ধান রাজকুমারের বন্ধুরা তছনছ করে দিয়েছিল। সেই ক্ষেতেই কাজ শুরু করল রাজকন্যা। যেন ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে এল। কয়েক দিন আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, মাঠে লাঙল চালানো হয়েছিল। একটা খাল এই মাঠের দক্ষিণ-পাশ দিয়ে চলে গেছে। তা থেকে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। চারদিকের মাঠে ধানের গন্ধে, ধানের বীজের গন্ধে একেবারে 'ম-ম' করছে। হাজার শাঁখ বেজে উঠল, মেয়েরা দিল উলুধ্বনি। হরদেব মাঝি ও বৈদ্যশাস্ত্রী রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজকন্যাকে দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরেছেন, কাঁচা সোনার মতন গায়ের রঙ—আহা, যেন ধান্যলক্ষ্মী!

যেন একই দেহে কাঁচা সবুজ ধান আর পাকা সোনা ধান। হরদেব মাঝির মেয়ে কমলার হাত থেকে বীজ নিয়ে মাঠে ছড়াল রাজকন্যা। চারিদিকে উলুধ্বনি উঠল। বৈদ্যশাস্ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। আর একটা মাঠে গিয়ে জল-বাদার ওপর দাঁড়াল রাজকন্যা। হরদেব নতুন এক রকমের ধানের চারা দিলেন রাজকন্যা সেই চারা সার দিয়ে পুঁতে দিল। হরদেব বললেন, এই ধানের চারা নতুন, আমরা তৈরি করেছি এই বছর। এর নাম দিই নাই। আজ থেকে ইয়ার নাম হবেক—মণিদীপা! এর গন্ধটা বেরুবেক পদ্মফুলের পারা! মাঠের সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল।

গ্রামে যেন দুর্গাপুজো লেগেছে। এবার দু'বার দুর্গাপুজো! মানুষ-গুলোর কত আনন্দ। ঘরে ঘরে ঢেঁকির শব্দ। আনন্দমাড়ুর মিষ্টি গন্ধ। নতুন কাপড়চোপড় পরে সবাই বিকেলে যাচ্ছে বাসমতী আশ্রমে। আর রাজকন্যা সারাদিন ধরে কোনো বাড়িতে আম গাছ, কোথাও জাম গাছ, কোথাও ডালিম গাছ পুঁতেছেন, কোথাও ধান ঝেড়েছেন, ঢেঁকিতে পাড় দিয়েছেন, কোথাও চাল কুটেছেন। ধান-সেদ্ধর গন্ধে কোনো বাড়ির চারদিক ভরে গেছে।

বাসমতী আশ্রমে চলেছে কর্মযজ্ঞ। এক দিকে কয়েকখানা ঘরে অসুস্থ মানুষের সেবা-শুশ্রূষা চলছে। দেখাশোনা করছেন বৈদ্যশাস্ত্রী নিজে। তাঁতঘরে কাপড় বোনা হচ্ছে, কোথাও মাটির শব্দ, কোথাও বা হরিণের শিঙের কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, ধাতুর কাজ শেখা শেখানো, প্রভৃতি চলছে সব। রাজকন্যা সন্ধ্যের সময় ঐ সব কাজ নিজে হাতে করার শিক্ষা নিতে লাগলেন একটু একটু করে, একটা একটা করে। তাই না দেখে গ্রামের মানুষের সেকি উৎসাহ। তিনদিনের কাজ একদিনে করে ফেলছে সবাই।

কিন্তু গ্রামের মাথারা সবাই সভা করে ঠিক করেছে যে, খাজনা বা শস্য তারা রাজকন্যা ছাড়া আর কারুকে দেবে না।

সে খবর গুপ্তচরেরা রাজপুত্রদের কাছে পৌঁছে দিল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। রাজপুত্ররা মহামন্ত্রীর সঙ্গে সলাপরামর্শে বসল। এখন কি উপায় হবে! শেষে এরা একমত হল ঠিক আছে। এতেই রাজ্য রক্ষা হবে। আসলে এটাই চাওয়া হয়েছিল। আমাদের বোন তো আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

তাকে দিলে তো আমরাই পাচ্ছি। কোনো ভাবনা নেই। বোনকে আমরা খুব আদর-যত্ন করে রাখব। আহা সে তো আমাদের পরম-পূজনীয় বাবা মহারাজাধীরাজ রাজচক্রবর্তী ধনপতি রাজের মেয়ে, মা না হয় আলাদা। তবে এতদিন ভাবছিলাম কেন সব? হাঃ—হাঃ—কি মজা! খাজনার জন্য আর ভাবতেই হবে না। ওরা নিজেরাই দিয়ে যাবে। আমরা আমোদ-আহ্লাদে জীবনটাকে কাটাতে পেলেই খুশি।

শেষে কুবেরজিৎ সন্দেহ প্রকাশ করল। বলল, কিন্তু ঐ অবস্থা হলে আমাদের কেউ মানবে? এ হতেই পারে না!

মকরকুমার বলল, মন্ত্রী মশাই আপনি কি বলেন? সহ্য করা যাবে কি ঐ অবস্থাটাকে?

মার্তণ্ড সিং বললেন, বড়কুমার, আপনার কি মত?

—আমি বলি কি, মকরকুমার বলল, তেতো ওষুধের মতন এ বছরটা ঐ অবস্থাটাকে মেনে নিন, সহ্য করুন। মণিদীপা ফিরে এসে রাজবাড়িতে ঢুকুক, তারপর নিজমূর্তি ধারণ করে সব কিছু অধিকার করে নেব। সৈন্যসামন্তকে হাতে রাখতে হবে, ভাল খাইয়ে-পরিয়ে! তাই ঠিক হল।

ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে গেল। রাজ্যের সব গ্রাম কিন্তু তখন জেগে কাজ করছে বিপুল উৎসাহে।

দশ

এদিকে ধূম্রকূট পাহাড়ের বন্দীশালায় ঘটনা ধুঁইয়ে চলেছে। ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে আগুন জ্বলে। সেই আগুন জ্বলে ওঠার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে ঘটনাটা। পুণ্যব্রত একদিন অন্তর বন্দীদের চিকিৎসা করতে আসেন। দ্বিতীয় দিন যেতেই গণদেব ওঁকে বলল—আমরা এই বন্দীশালা ভেঙে পালাব।

পুণ্যব্রত অবাক হয়ে গণদেবের মুখের দিকে তাকান। বলেন, অত অধৈর্য হলে কি চলে ভাই। আহত তোমরা, যদি ধরা পড় তো পঙ্গু করে রেখে দেবে! ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে নিশ্চিত সাফাল্য জেনে কাজ করতে হয়।

—বন্দী-জীবন থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল! গণদেব বলে।

—তোমার জীবনটাকে বাজে খরচ করার অধিকার তোমার নেই! দেশে তোমাদের মত ছেলেদের প্রয়োজন আছে। আর আমি কি এমনি আসছি। শোন—। বলে পুণ্যব্রত ওর কানে কানে ফিসফিস করে কি সব বললেন। গণদেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পুণ্যব্রত বললেন, সৈন্যরা সব কারা? তারা তো সাধারণ গ্রামের মানুষ, চাষী। তারা সবাই বুঝেছে গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার। তাদের খাওয়াপরার খুব সুবিধে দিয়ে তাদের দিয়েই তাদের নিজের জনের, আপনার জনের ওপর অত্যাচার করানো হচ্ছে। তারা জানে যে তোমরা কিছুই অন্যায় করোনি।

এ ব্যাপারটা সকলের মধ্যে আলোড়ন তুলবে, তারপর একবার মন জানাজানি হয়ে গেলে রাজকুমারদের কোনো জারিজুরিই খাটবে না। মন্ত্রীটন্ত্রী সবাই শায়েস্তা হয়ে যাবে। কয়েক দিন পরে পুণ্যব্রত সকালে এসেই সেনাপতির আদেশ নিয়ে বন্দীদের হাতের পায়ের শেকল খুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর চলল চিকিৎসা। তারপরে একটু

ব্যায়াম করালেন। এইভাবে মাসখানেক গেল। ওরা সুস্থ হয়ে উঠলেও পুণ্যব্রতের গোপন নির্দেশে আগের মতই অসুস্থ থাকার ভান করে থাকল। চলাফেরা যেন করতেই পারে না এমন ভাব দেখাতে লাগল। গণদেবের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হতে লাগল ও যেন আর জীবনে হেঁটে-চলে বেড়াতেই পারবে না।

সেনাপতি নিশ্চিন্ত—যাক বাবা, বন্দীদের ব্যাপারে ভাবার কিছু নেই। ওরা আর যাই করুক পালাতে পারবে না। পালাতে না পারলেই হল, কারণ বন্দী পালালে সেনাপতির শাস্তি হতে পারে। শুধু যে চাকরি যাবে তাই নয়, তাঁকেই হয়তো বন্দী থাকতে হবে ঐরকম। তবু সাবধান থাকা ভাল—তাই চিকিৎসার দিনে একবার করে হাতে-পায়ের শেকল খুলে দেয়া হয়। চিকিৎসা হয়ে গেলে শেকল লাগানো হয় আবার। সেনাপতি নিজে দেখে নেন। ব্যাস, নিশ্চিন্দি। বাবা বজ্র আঁটুনি! বন্দীরা একচুল এদিক-ওদিক যেতে পারবে না—! হুঁ—হুঁ—!

একদিন ভোরে খুব বিষ্টি হচ্ছে। পুণ্যব্রত দু'জন দাড়িওলা সঙ্গী নিয়ে চিকিৎসা করতে এলেন। চারিদিকে অন্ধকার করে কালো মেঘ মাথার উপর ঝুলে পড়েছে। দিনের বেলায় মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাতি জ্বেলে, মশাল জ্বেলে কাজ করতে হচ্ছে দুর্গের মধ্যে। বৃষ্টিতে পাহাড় দেখা যাচ্ছে না।

যাইহোক চিকিৎসা শেষ করে পুণ্যব্রত তার দাড়িওলা সঙ্গীদের নিয়ে ঐ দুর্যোগে চলে গেলেন।

এই রকম করে ঐ বর্ষার মধ্যে কয়েক দিনই তিনি এলেন গেলেন।

শেষে একদিন সেনাপতিকে বলে গেলেন—আর আসতে হবে না! চিকিৎসা শেষ হয়ে গেছে।

যাক, আবার নতুন করে যেন নিশ্চিন্ত হলেন সেনাপতি। এইভাবে ক-দিন কাটল। শেষে একদিন বন্দীদের পরীক্ষা করার দিন এল। পরীক্ষার দিন নাম ডাকা আরম্ভ হল—গণদেব মাঝি!

কেউ সাড়া দিল না। বন্দীরা পরস্পরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগাল। তখন একজন মোটাসোটা গ্যাট্টাগোট্টা দাড়িওলা বন্দীকে আলাদা করে কাছে এনে সেনাপতি রাগে ফাটতে ফাটতে বললেন—তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেনহ্যাঁ? সাপের পাঁচ-পা দেখেছ নাকি? তুমি গণদেব কিনা?

—আজ্ঞে না, আমি কার্তিক মাঝি।

—এ্যাঁ? তুমি কোত্থেকে এলে?

—আজ্ঞে আমাকে এক গুণিন্ এখানে রেকে গ্যাচেন!

সেনাপতির চোখ ভ্রূর বেড়া ডিঙিয়ে কপালে উঠে গেল।

আর একজনকে বললেন—তুমি প্রবল কিনা জবাব দাও?

সে লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাড়ি চুলকে বলল—

—আজ্ঞা আমি বড়ই দুর্বল।

—থাবড়ে মুখ জেবড়ে দেব। রসিকতার জায়গা পাওনি! নাম বলো?

—আজ্ঞা, আমার নাম দুলাল মালো।

—আঃ ম'লো। এখ নে মরতে এলে কেন?

—আজ্ঞা গুণিন আনিছে। অসুক হয়েছিল। গুণিন সঙ্গে করে এখানে এনে বলল—একমাস থাকলে সেরে যাবি রে! থাক! তাই আছি, আজ্ঞা!

সেনাপতির চোখ দুটো বোম্বাই রাজভোগের মতন বড় বড় হয়ে গেল।

আর একজনকে ডেকে বললেন—হেই, তোমার নাম সুবোধ কিনা?

—বোধহয় না!

—ফক্কুড়ি! সুবোধ নও? লাঠি পড়লেই সুবোধ হবে!

—আজ্ঞা, আমার বাবার নাম সুবোধ।

—এখানে এলে কি করে?

—ঐ একই রকমে।

আর একজনকে বললেন—তুমি তো শুকদেব ?

—আজ্ঞা অসুককুমার !

—আমার সঙ্গে রঙ্গ !

—আজ্ঞা সত্যি বলচি ! ছেলেবেলায় খুব অসুখ হত বলে মা অসুককুমার বলে ডাকত !

—দাঁড়াও তোমাদের দাড়িতে আগুন জ্বেলে দুধ গরম করব হতভাগা ! আর একদিকে ফিরে বললেন—তুমি দেবল ?

—আজ্ঞা, দেহে একদম বল নেই ?

—তুমি - তুমি—বন্দী ?

—আজ্ঞা বন্দী !

—শুনে শুনে সেনাপতি ক্ষেপে গেলেন। আমি কি পাগল হয়ে যাব। তোমরা পেয়েছ কি ? তরমুজের মতন বড় বড় চোখ করে বললেন—কি ফন্দী ! বন্দীদের দাড়ি রাখিয়েছে, তারপরে দাড়িওলা বদলি লোক রেখে তাদের নিয়ে সট্‌কেছে ! একে একে পরীক্ষা করে দেখা গেল গণদেবের কেউ নেই।

—তা'হলে ? এ ঐ বৈদ্যের কাজ ! কি ভয়ংকর ! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি ! ছোট রাজকে খবর দিচ্ছি ! বৈদ্যের মাথা কাটা যাবে ! কিন্তু, সেনাপতি মাথায় হাত দিলেন। তার আগে নিজের এমন সুন্দর গন্ধতেল মাখা মাথাটা যাবে যে !

ছোট রাজকুমারের কানে এ কথা গেলে কি রক্ষে আছে ! দু'টুকরো করে দেবে !

—তা'হলে !

কাজ নেই খবর দিয়ে ! সবাই জানুক বন্দীরা সব ঠিক আছে ! কে আর দেখতে আসছে ! তারপরে যা হবার হবে !

সেনাপতি তখন ওদের ডেকে বললেন—ঠিক আছে, বাবারা ! তোমরা কয়েক মাস থাক ! থাকলেই অসুখ সেরে যাবে ! আমি নতুন বৈদ্যের ব্যবস্থা করছি।

মনে মনে বললেন—সর্বনাশ! সব পাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেল! এখন নিজের প্রাণ পাখিটা খাঁচা ছাড়া না হয়!

সেনাপতি সব খবর চেপে গেলেন। কেউ জানল না যে ধূম্রকূট পাহাড়ের বন্দীশালাটা ফন্দীশালা হয়ে গেছে।

সবাই জানল বন্দীশালায়—গণদেব ও প্রবল-দেবলরা সব্বাই শেকল ঝনঝন, ঘাড় টনটন, কোমর কন্‌কন্‌, পা ঝনঝন, বন্‌বন্‌ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আসলে সেনাপতিরই অবস্থাটা ঐ রকম। তিনি বাবার নামটাই ভুলে আছেন। আর নিজের শার্দুলবিক্রম নামটাকে ভুলে সজারুবিক্রম হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সব সময় চিন্তা—কি হবে উপায় মোর, কি হবে উপায়। চারদিকেতে অন্ধকার—হায়—হায়—হায়—।

এগারো

এদিকে রাজকন্যা বৈদ্যশাস্ত্রীর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে রয়েছেন বৈদ্যশাস্ত্রী। মাঝেমাঝে বৈদ্যশাস্ত্রীর প্রিয় শিষ্য পুণ্যব্রত এসে দেখা করে যাচ্ছেন। গুরুর সঙ্গে করছেন সলা-পরামর্শ। রাজকন্যাকে খবর দিয়ে যাচ্ছেন বন্দীরা খুব ভাল আছে, তাদের চিকিৎসা প্রায় শেষ। কিন্তু আসল ব্যাপারটা রাজকন্যাকেও জানান নি। শুধু জেনেছেন বৈদ্যশাস্ত্রী।

রাজকন্যার অনেক গ্রাম ঘোরা হল—বাসমতী মধুডিহি, সেখান থেকে রত্নধানী, সেখান থেকে সোনাঝরি, সোনাঝরি থেকে ধানসিঁড়ি, ধানসিঁড়ি থেকে হীরামণি। রত্নধানী, হীরামণি আর সোনাঝরিতে—চুনিপান্না সোনা আর হীরের খনি আছে। সেই সব খনি থেকে নিজে হাতে রত্ন আর সোনা তুলে পরিষ্কার করে শ্রমিকদের মতন কাজ করেছে রাজকন্যা। ধানসিঁড়িতে পদ্মগঙ্গা ধান গাছের চারা বুনেছে। এখন সমুদ্রের ধারে মুক্তাগাছা গেছে। সেখানে জলের ভেতর থেকে মুক্তো তোলা হয় ডুব দিয়ে দিয়ে। রাজকন্যা সমুদ্রে নেমে মুক্তো তুলছে রোজ —খুব ভাল লাগছে।

প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে আশ্রম তৈরি করেছেন বৈদ্যশাস্ত্রী। সেগুলো সবই সেবাশ্রম আর শিল্পাশ্রম হয়েছে। ঠিক যেমনটি বাসমতী গ্রামে করা হয়েছিল।

বাসমতী গ্রামের সেবাশ্রমে একদিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ ষোলোজন নতুন সেবক সন্ন্যাসী এলেন। গেরুয়া পরা। মুখে ঘন দাড়ি, মাথার চুল ঝরনার মতন ঘাড় বেয়ে নেমেছে, চুলে জট পড়েছে। তাঁরা গ্রামের লোকের, সেবাশুশ্রূষায় মন দিল। কারা তাঁরা? সবাই জানল তাঁরা পুণ্যব্রতের শিষ্য। দিনের বেলায় তাঁদের বড় একটা দেখা যায় না। সন্ধ্যে থেকে কাজকর্ম শুরু করেন সবাই। লোকজনের চিকিৎসা,

উপদেশ, গায়ে-গতরে খাটা সব করেন। তাঁদের কথা শুনে, তাঁদের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে, দলে দলে লোক তাঁদের উপদেশ শোনার জন্যে আসতে থাকে।

ওঁদের পরিচয় কেউ জানতেই পারে না। শুধু জানেন পুণ্যব্রত আর বৈদ্যশাস্ত্রী। যারা পরিচয় জানতে চায়, তাদের ওঁরা বলেন আগে তৈরি হও! দিন এলে পরিচয় পাবে!

ওরা কাজ করে চলেন। সেবাশুশ্রূষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সবাইকে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্যে, ভালর জন্যে, জীবন উৎসর্গ করার শিক্ষা দেন। শৃঙ্খলা, ত্যাগ, সাধারণ মানুষের অধিকার আর নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের শিক্ষা দেন।

ফসল ফলানো, খনির রত্ন তোলা, ধাতু তোলা, সবই দেশের কাজ —এই শিক্ষাও দেন ওঁরা।

বাসমতী গ্রামের প্রতিটি মানুষ গণদেবের আদর্শে আগে থেকেই তৈরি ছিল, তাদের সুশিক্ষিত করতে বেশিদিন লাগল না।

এরপরে সন্ন্যাসীর দল রাজকন্যা যে পথে যে-যে গ্রামে গেছে, সেই পথে সেই সেই গ্রামের আশ্রমে আশ্রমে ঐ একই কাজ করতে করতে এগোতে লাগলেন। এই ভাবে ওঁরা মুক্তাগাছায় গিয়ে উপস্থিত, রাজকন্যা আবার তখন আরো কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে, ঝাউঝিরি হয়ে সেগুনবনীতে তার কাজ করছে।

এই ভাবে এগারো মাসে এগারোটা গ্রামের কাজ শেষ করে, রাজকন্যা যাবে সামন্ত সিং-এর দেওদার গ্রামে। দশ মাস হয়ে গেছে। সারা দেশে একটা দারুণ সাড়া জেগেছে। প্রজারা মহা উৎসাহে চাষবাস করছে, মাঠে মাঠে সোনার ধানের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। কোথাও বা সবুজ ধানের সমুদ্রে হাওয়া ঢেউ তুলে চলল। সব গ্রাম থেকে আবেদন আসতে লাগল লক্ষ্মী যেন তাদের গ্রামে যায়। রাজকন্যা সকলকে জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি তার সারাটা জীবন লেগে যায় তাই সই, তবু সে দেশের প্রতিটি গ্রামে যাবে। প্রতিটি গ্রামের মাঠে নিজে

হাতে চাষের কাজ করবে। প্রতিটি খনিতে, শিল্পে নিজে হাত লাগাবে।

এদিকে সমুদ্রের ধারে মুক্তাগাছার আশ্রমে সন্ন্যাসীরা কাজ করে চলেছেন। একদিন হঠাৎ খবর এল সন্ধ্যেবেলায় বৈদ্যশাস্ত্রী পুণ্যব্রতকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে আসছেন। সন্ন্যাসীরা কাজকর্ম সেরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগল। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুম্ হুম্—হুম্-হুম্ শব্দ আসতে লাগল দূর থেকে। শব্দ বেড়ে চলল, এগিয়ে আসতে লাগল। শেষে তিনটি পাল্কী এল আশ্রমের বাগানে। পাল্কী থেকে নামলেন বৈদ্যশাস্ত্রী, পুণ্যব্রত আর দু'জন সন্ন্যাসী। ওরা আশ্রমের ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেন। ঘরের দোর বন্ধ হয়ে গেল।

ওরা মন্ত্রণায় বসলেন। ষোলোজন সন্ন্যাসী বৈদ্যশাস্ত্রী আর পুণ্যব্রতকে প্রণাম করলেন। বৈদ্যশাস্ত্রী চাপা গলায় বললেন, বৎস গণদেব! আমি এতদিন ইচ্ছে করেই জানতে দিইনি যে আমি তোমাদের আসল পরিচয় জানি! তোমাদের কাজে আমরা সবাই খুব সন্তুষ্ট। সবচেয়ে ভাল কাজ হয়েছে বাসমতী গ্রামে, সেখানেও তোমরা পরিচয় গোপন রাখতে পেরেছ আবেগের মাথায় এমন কিছু করে বসোনি, যার ফলে জানাজানি হয়ে যেতে পারত। দেশের জন্যে, দেশের সাধারণ মানুষের জন্যে, তোমাদের ত্যাগ ও কষ্ট-স্বীকারের তুলনা হয় না। তোমাদের মতন দেশকে এমন করে কেউ ভালবাসতে পারেনি।

দেশকে যারা ভালবাসে তাদের কিন্তু কষ্ট পেতে হয়, যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় অথচ সব দায়িত্বও বইতে হয়। যত দুঃসাহসী কাজ করবার, মৃত্যুর মুখোমুখি হবার ঝুঁকি তাদেরই নিতে হয়।

এবার কঠিনতম কাজ তোমাদের সামনে। সব দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে, আমরা আছি। পুণ্যব্রত একদিকের সব দায়িত্ব নেবে। ঐ কাজটা হলে তোমার আর একটা কাজ বাকি থাকবে। সেটা হয়ে গেলে তুমি স্বাধীনভাবে কাজ করবে, কিভাবে করবে তুমি নিজেই ঠিক করবে, অন্যে শুধু পরামর্শ টাই দেবে।

গম্ভীর গলায় গণদেব বলল—গুরুদেব, আপনার জন্যেই আমাদের প্রাণরক্ষা হয়েছে,আমরা মুক্ত হয়েছি, এখন দেশের মানুষের মুক্তির জন্যে, ভালর জন্যে, জীবনরক্ষার জন্যে যে কোনো কাজ করতে আমরা প্রস্তুত। এমনকি আমাদের জীবনগুলোও দিতে প্রস্তুত।

বৈদ্যশাস্ত্রী—শোনো, নীলমুকুট পাহাড়ের নিচে, স্ফটিক সমুদ্রের ধারে রাজ আশ্রমে ধনপতি রাজাকে বিশ্রামের নাম করে রাজপুত্রর বন্দী করে রেখেছে। তাদের কুমতলব দিয়ে সারা দেশটাকে শাসনা করছে আসলে মার্তণ্ড সিং। মহারাজ ধনপতি আর যাই হোক দেশ শাসন করতে জানতেন। তাঁর সময়ে দেশ ধনধান্যে ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল। সাধরণ মানুষের বিশেষ অভাব ছিল না। ধনপতির দোষ ছিল। রাজাদের যে সব দোষ থাকে তার প্রায় সবই ছিল। অহংকার, জাতি ভেদবুদ্ধি, মানুষে মানুষে অসাম্য জাগানো। উঁচু বংশের লোকদের সব সুযোগ সুবিধে দেয়া। দেশের চাষী শ্রমিক, যারা দেশের আসল মানুষ তাদের ছোট ভাবা—এ সবই তাঁর ছিল। মনে হয় এতদিনে তাঁর চোখ খুলছে। ঐ দোষের জন্য তিনি যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে আদরের কন্যা তাঁর বিরোধী হয়েছে, বিদ্রোহ করেছে। তাঁকে রাজত্ব ত্যাগ করতে হয়েছে। তোমাদের কি মনে হয়?

গণদেব—গুরুদেব, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনার মনের কথাটা বলুন।

বৈদ্যশাস্ত্রী—রাজা ধনপতি যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছেন। এবার তাঁকে শান্তিতে মুক্ত জীবনযাপন করার সুযোগ দিতে হবে। না, রাজত্ব করার কথা বলছি না। ঐ ব্যবস্থাটাই পাল্টে দিতে হবে। উনি নিজে থেকেই যাতে তা করেন তার সুযোগ করে দিতে হবে। আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকলে, আমাদের কাজের আদর্শের পরিচয় পেলে, তিনি নিজেই একটা নতুন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকবেন।

গণদেব—এখন কি আদেশ আপনার গুরুদেব?

বৈদ্যশাস্ত্রী -এখন ঐ দুর্গম জায়গা থেকে রাজাকে উদ্ধার করে

আনতে হবে। সব সময় এক হাজার প্রহরী তাঁকে পাহারা দিচ্ছে, তাই—

গণদেব—তাই কি? বলুন, গুরুদেব?

বৈদ্যশাস্ত্রী—তোমরা তো নৌকো চালানোয়, সাঁতারে, পৃথিবীর সেরা ছেলে। সমুদ্র-পথে ছিপ-নৌকোয় করে নীলমুকুটের কোলের আশ্রম থেকে রাজাকে উদ্ধার করে আনতে হবে। সমুদ্রের দিক থেকে ভয় নেই কারণ ওদিকে কোনো প্রহরী নেই। আর শোনো, ওঁর সঙ্গে ছোটরানীও বন্দীজীবন যাপন করছেন, তাঁকেও আনতে হবে। খুব যত্ন করে, সম্মানের সঙ্গে আনবে। পারবে না?

গণদেব—গুরুদেব, এ কাজের ভার পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি। আপনার আদেশ আমাদের কাছে বেদবাক্যের মতন। প্রাণ পণ করলাম আগামী অমাবস্যার অন্ধকারে কাজ হাশিল করব।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। মহারাজা ধনপতি স্ফটিক সমুদ্রের ধারে আশ্রমের বাগানে পায়চারী করছেন, সঙ্গে ছোটরানী। ছোটরানী ম্লান হয়ে গেছেন। মণিদীপার কোনো খবর তাঁর কাছে আসে না বলে ভাবনায় ভাবনায় রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন তিনি। বেড়াতে বেড়াতে রাজা মশাই বললেন—জান ছোটরানী, আমার পাপেই আমি শাস্তি ভোগ করছি। রাজপুত্রদের আমিই প্রথমে কুমন্ত্রণা ও কুপরামর্শ দিয়েছিলাম। সেই পরামর্শ ওরা শেষে আমার ওপরেই খাটালো, অপদার্থদের বদবুদ্ধি শেখালে এমনিই হয়। আমি তখন রাজ্য রক্ষার, রাজার সম্মান রক্ষার, বংশমর্যাদা রক্ষার মোহে ঐ সব শিখিয়েছিলাম। ওরা সেটাকে খারাপ কাজে লাগাল। ওরা প্রজাদের কাছে আর দেশে দেশে প্রচার করেছে, আমি নাকি ইচ্ছে করে সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রম-জীবন যাপন করছি, আর ফিরব না—রাজ্য ত্যাগ করেছি। অথচ আমাকে বন্দী করে রেখেছে। মুখে বলছে না, কিন্তু কোথাও যাবার স্বাধীনতা নেই।

—মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—ব্যাপারটা বুঝতে

আপনার অনেক সময় লেগেছে। আমি যখন স্বেচ্ছায় আপনার কাছে চলে আসি, তখনও আপনি বুঝতে পারেন নি।

—সত্যি! কিন্তু বন্দী-জীবনের চেয়ে মৃত্যুও ভাল। মাঝে মাঝে মনে হয় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে জীবনটাকে শেষ করে দিই!

—মহারাজ অমন কাজও করেন না। যদি করেন তো তার আগে আমাকে মরতে দিন। আমি শুধু আছি লক্ষ্মীর মুখ চেয়ে! আমি আমার লক্ষ্মীর ওপর অন্যায় করেছি বলে আরো কষ্ট পাই! ও ঠিকই বুঝেছিল।

ছোটরানী শুনে বললেন অন্যায় অত্যাচার কুশাসন বেশিদিন চলতে পারে না। ভাল সময়ের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে পাপ দূর করতে বেশ কিছুদিনের তপস্যা লাগে মহারাজ আরো কিছুদিন তপস্যা করুন। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট অভাব প্রাণ দিয়ে রুখুন, বুক দিয়ে দূর করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি কু-রাজা নন —মানুষেরই ভুল হয়, দোষ হয়, মোহ আসে। মানুষের সেবা করায় আবার সব কেটে যাবে।

বলতে বলতে সমুদ্রের রঙ পাল্টে গেল। কে যেন তার দোয়াতের সব কালো কালিটা সমুদ্রে ঢেলে দিল। সমুদ্রের নীল কালি, কালো কালি হয়ে গেল। দূর দিগন্ত থেকে যেন কালো কালো জাহাজ-ভর্তি অন্ধকার এসে খালাস হতে লাগল আশপাশে। সেই অন্ধকারের মালিক প্রথমে তাঁর সহচরী সন্ধ্যাকে পাঠিয়েছিলেন, এখন তিনি নিজেই এলেন—তাঁর নাম রাত্রি। পৃথিবীতে রাত্রির রাজত্ব শুরু হয়ে গেল।

ছোটরানী বললেন—মহারাজ, সন্ধ্যে উতরে গেল, এবারে আপনি পুজোয় বসবেন।

একটু পরে। আর একটু এই পাথরটায় বসে থাকি এস না, বেশ লাগছে। আজ তো অমাবস্যা, একটু রাত করে পুজোয় বসব।

তা'হলে জলের ধার থেকে উঠুন, ওপরে গিয়ে বাগানে বসুন। ছোটরানী বললেন।

তাই হল। রাজা-রানী জলের ধারে পাথর থেকে উঠে বাগানের পাথরের চাতালের ওপরে গিয়ে বসলেন।

চারদিক থেকে নানা ফুলের গন্ধ আসতে লাগল, ঠাণ্ডা সরবতের মতন মিষ্টি বাতাস বইতে লাগল।

রাজা বললেন—আজ, আমার লক্ষ্মীকে বড্ড মনে পড়ছে। কোথায় কিভাবে রইল মেয়েটা। এমন একটা জেদ করলাম সবাই যে রাজ্যপাট সব ওলটপালট হয়ে গেল। তবু যদি সে সুখী হত! সেও তো আমাদের মতনই বন্দী!

সেই রকমই তো দেখে এসেছি। ছোটরানী বললেন—আমার সঙ্গে আসতে চেয়ে খুব কান্নাকাটি করল। ওরা আসতে দিল না!

লক্ষ্মীর কথা শোনার জন্যে রাত চুপ করে বসে থাকল না, বেড়েই চলল। অনেক রাত হয়ে গেল। রাজামশাই পুজো করার জন্যে উঠতে যাবেন, এমন সময়ে বাগানের প্রতিটি ফুল গাছের আড়াল থেকে খস্‌খস্‌ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এক-এক চাপ ঘন অন্ধকার এগিয়ে এসে, অন্ধকার দিয়ে গড়া সুঠাম মূর্তি হয়ে রাজা-রানীকে ঘিরে দাঁড়াল। অতগুলি ছায়া-মূর্তি দেখে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রানী আঁতকে উঠলেন!

- বন্দীকে আবার বন্দী করবে নাকি তোমরা? না, হত্যা করতে চাও?

রাজপুত্রদের গুপ্তঘাতক নিশ্চয়ই? কিন্তু এতদূর?

মূর্তিগুলোর হাতে আলো ঠিকরানো অস্ত্র ছিল। বল্লম, সড়কি, তলোয়ার। সেগুলো নড়ে উঠল।

ওদের নেতা চাপা গলায় বলল—আপনাদের মুক্ত করে নিতে এসেছি। এখুনি, এই অবস্থায় আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

ঐ অন্ধকারে নেতার সাদা দাঁতের চিহ্ন দেখা গেল শুধু।

—কিন্তু অজানা মুক্তিটা যদি বন্দীত্ব থেকেও খারাপ হয়? আমি যদি তা সহ্য করতে না পারি? রাজা বললেন।

—মহারাজ উপায় নেই, আপনাকে যেতেই হবে। চীৎকার করলে মুখ বন্ধ করার যে-কোনো ব্যবস্থা নেব। চলুন।

—কোনদিকে ?

—তোমরা কি দেবতা না জলদস্যু ?

—আমরা জলকাদার মাটির মানুষ ! চলুন মহারাজ।

রাজা-রানী যন্ত্রের মতন ওদের মাঝখানে থেকে এগিয়ে চললেন। জলের ধারে গিয়ে দেখলেন দু'খানা বড় বড় ছিপ নৌকো ঘাটের সঙ্গে লেগে রয়েছে, ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে। তাঁদের নৌকোয় উঠিয়ে

খড়ের বিছানায় বসানো হল। ছ'জন করে কালো পাথরে কোঁদা তেল চুকচুকে ছেলে নৌকো বাইতে শুরু করে দিল। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলোকে কাটিয়ে ছিপ ছুটো তিমি মাছের মত এগিয়ে চলল। শেষে দূরে স্থির সমুদ্রে পড়ে তীরের মতন ছুটল। আবছা-আবছা নীলমুকুট পাহাড়টা পেছনে মিলিয়ে গেল। কোথায় কোনদিকে যাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারলেন না রাজা ধনপতি আর ছোটরানী।

বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে সাঁতার কেটে যেন ক্লান্ত হয়ে নৌকোগুলো থামল। ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল শব্দ, হাওয়ার শব্দ, আর কোনো শব্দ নেই।

—নামুন মহারাজ। নেতার গম্ভীর কণ্ঠ শুনে রাজা-রানী উঠলেন।

—এ কোথায় এলাম ? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনারই রাজ্যে। এখুনি সব জানতে পারবেন।

রাজা-রানীকে ওরা খুব সাবধানে যত্ন করে নামালো। তারপরে একটু দূরে একটা আশ্রমের মধ্যে নিয়ে গেল।

—এ জায়গাটার নাম কি ? এত আঁশটে গন্ধ কেন ? ছোটরানী জিজ্ঞেস করলেন।

—এটা মুক্তাগাছা। এখানে সমুদ্রের তলা থেকে ডুবুরিরা মুক্তোভরা ঝিনুক তোলে। সেই ঝিনুকের আঁশটে গন্ধ।

কথা বলতে বলতে ওঁদের আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হল। রাজারানী দেখলেন, একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে আসছেন। কাছে আসতে পিদিমের আলোয় রাজা তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন।

একি, বৈদ্যশাস্ত্রী ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি !

রাজা ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—বলুন, একি ইন্দ্রজাল ! কি করে আপনি আমাকে আনলেন ? ওরা কে ? রাজা আনন্দের উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেললেন। ছোটরানী বৈদ্যশাস্ত্রীকে প্রণাম করে বললেন—আমার লক্ষ্মী কোথায় গুরুদেব ? কেমন আছে ? আপনি নিশ্চয়ই জানেন—দয়া করে বলে আমাকে বাঁচান !

—মাগো, আপনার মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! একটা ছোট্ট মেয়ে দেশটার মনের প্রাণের সিংহাসনে রানী হয়ে বসেছে। দেশের মানুষ-গুলোকে নিজের ভাই-বোন, কাকা-কাকী করে নিয়েছে। সবকিছুকে পাল্টে দিয়েছে। সে ভাল আছে মা, খুউব ভাল আছে !

—একবার নিয়ে আসুন ! বুকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদে বাঁচি ! প্রাণটাকে জুড়োই—রাজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—কোথায় ও ? রানী এদিক-ওদিক তাকাতে লাজলেন।

বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন—আহা, মা-বাপের প্রাণ ! একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ঠিক সময়ে তার দেখা পাবেন গো মা ! একটু ধৈর্য ! এতদিন তো কষ্ট করেছেন, আর কয়েকটা দিন কষ্ট করুন। সময় হলেই দেখা

পাবেন। এবারে চলুন, সামান্য কিছু আহার করতে হবে। আশ্রমে রাজ-অতিথি, সোজা কথা !

এই বলে পাশের একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন। গ্রামের কয়েকটি মেয়ে এসে ওদের ফলমূল আর গন্ধরাজ ধানের চিঁড়ের পায়েস দিয়ে গেল। রাজারানী অনেক দিন পরে তৃপ্তি করে খেলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন—এবার কিছু গোপন পরামর্শ আছে। আর একটা ঘরে ওঁদের নিয়ে দোর বন্ধ করে দিলেন বৈদ্যশাস্ত্রী। চাপা গলায় বললেন—খুবই গোপন কথা। মনের মধ্যে রেখে দেবেন। আমাদের সকলের ইচ্ছেটাকেই জানাচ্ছি, রাজকন্যারও এই একই ইচ্ছে ! বলে উনি আরো চাপা গলায় অনেক গোপন কথা বললেন, সলা-পরামর্শ করলেন। রাজা-রানী ছাড়া আর কেউ তা শুনতেই পেল না।

শুনতে শুনতে রাজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। উনি বারে-বারেই বৈদ্যশাস্ত্রীর হাত চেপে ধরতে লাগলেন। সব কথা শেষ হয়ে যাবার পর ছোটরানী আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে বৈদ্যশাস্ত্রীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

বললেন—এতদিন ভগবানের কাছে যা যা চেয়েছি, সেই সব পাওনার কথা আপনার মুখ থেকে দৈববাণীর মতন, বরের মতন শুনতে পেলুম। আর আমার মনে কোনো কষ্ট নেই ! বড় শান্তি দিলেন গুরুদেব ! আপনার পায়ে কোটি কোটি প্রণাম !

এদিকে পরের দিন সকালে নীলমুকুট পাহাড়ে আর এক কাণ্ড ঘটল। নীলমুকুট পাহাড়ের দুর্গে-সুবর্ণদ্বীপ রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রধান সেনাপতি সিংহবিক্রম সিংহ থাকেন। তাঁরও মাথায় নীলমুকুট, পাহাড়ের মতন, দৈত্যের মতন তাঁর চেহারা। রোজ পাঁচ-হাঁড়ি ভাত, একটা গোটা হরিণের ঝোল খান তিনি, সঙ্গে গণ্ডা-গণ্ডা মোণ্ডামেঠাই, দু-হাঁড়ি দই আর এক কলসি পায়েস, শেষে এক জালা জল খেয়ে তবে তাঁর খিদের জ্বালা জুড়োয়।

এ-হেন সেনাপতি মশাই সকালে সবেমাত্র বিশ গণ্ডা নাড়ু আর একজালা দুধ খেয়ে জলযোগ শেষ করেছেন—অমনি আশ্রম থেকে এক জন প্রহরী এসে দেখা করতে চাইল। বিরক্ত হয়ে উনি প্রহরীকে ভেতরে আনতে বললেন। অত পরিশ্রম করে জলযোগ করে, কোথায় একঘণ্টা ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করবেন, তা নয় যত সব বাজে কথা শোনো।

প্রহরী কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি হেঁড়ে গলায় বললেন—কি ব্যাপার? এই সাত-সকালে আবার কি গোলমাল পাকালে?

প্রহরী বলল—আজ্ঞে গোপনে বলব।

উনি সক্কলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দোর বন্ধ করে দিলেন।

—বলো?

—প্রভু, মহারাজ আর ছোটরানী আশ্রমে নেই, ওঁদের পাওয়া যাচ্ছে না!

—সেকি! ওঁরা কি কর্পূর না তুলো যে উবে যাবেন, উড়ে যাবেন? কিংবা মাছ নাকি হে যে জলে পালিয়ে যাবেন? কি ব্যাপার—সত্যি বলো? তা না হলে তোমার মাথা থাকবে না!

লোকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল—প্রভু, কিছুই বুঝতে পারছি না। কাল সন্ধ্যেবেলায় জলের ধারে বাগানে বসে ওঁদের গল্প করতে দেখেছি। তারপরে আর দেখতে পাইনি। জলের দিকে যেতে পারবেন না ভেবে প্রহরীদের আশ্রমের এদিকে রাখি। জলে ঝাঁপ দিলেন নাকি? তা'হলে তো আর রক্ষা নেই! সমুদ্রের এই অংশটায় হাঙর গিজ্‌গিজ্‌ করছে প্রভু!

সিংহবিক্রমের সকালের ঘুমের আমেজটা কর্পূরের মতোই উবে গেল।

—সব্বোনাশ! এখন উপায়?

—তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। কোত্থাও নেই!

—কে কে জানে ব্যাপারটা?

—আজ্ঞে, আমি ছাড়া কেউ জানে না, প্রভু!

—ঠিক আছে, এদিকে এস। এই তরোয়াল ছুঁয়ে একটা শপথ

করতে হবে। উনি তরোয়ালটা খাপ থেকে খুললেন। প্রহরী কাছে আসতেই কচুপাতার ডগার মতন টক করে ওর মুণ্ডটা কেটে ফেললেন। লোকজন ডেকে ওর দেহটাকে সিন্দুকে ভরে সিন্ধুতে ফেলে দিতে বললেন। কাজ চুকল।

লোকজনদের বললেন—ও বন্দীদের নিয়ে পালাচ্ছিল। আমি ধরে ফেলেছি। আমার সঙ্গে চলাকি! আমি না সিংহবিক্রম সিংহ একা একশোজনের খাবার খাই।

সবাই চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বললেন—যাক বাব্বা! বাঁচা গেল! রাজা-রানীকে পাওয়া যাচ্ছে না! একথা যদি একবার কুমারদের আর কুষ্মাণ্ড মন্ত্রীর কানে যায়, তাহলে আমাকে কচুকাটা করে ছাড়বে!

কেমন বুদ্ধি করেছি—লোকটা শেষ! এখন আর কেউ জানতে পারবে না। এখুনি প্রচার করে দেব রাজা-রানীর নিরাপত্তার জন্যে দুর্গের চিলেকোঠার ঘরে রাখা হয়েছে। আমি ছাড়া কেউ তাদের কাছে যেতে পারবে না খাবাবারদাবার ওদের নাম করে আমার দশতলার ঘরে দিয়ে যাবে, আর আমি সাবাড় করব! ভালই হল! খুব খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। রাজা-রানীদের খাবার তো ফেলনা নয়!

সিংহবিক্রম তাই করলেন। কিল খেয়ে কিল চুরি করা যাকে বলে। চারদিকে প্রচার হয়ে গেল—কাল রাত থেকে রাজা-রানী দুর্গের একেবারে মাথার ঘরে চিলেকোঠায় আছেন। জলের ধারে ওদের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, তাছাড়া একজন লোক ওঁদের নিয়ে সরে পড়ছিল। নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা দল কাজ করছে। তাছাড়া রাজা-রানী নির্জনে তপস্যা করতে চেয়েছিলেন। নীলমুকুট পাহাড়ের দুর্গের সবাই তাই জানল। দেশের লোকতো জানলই। সেই যে ধূম্রকূট পাহাড়ের দুর্গের সবাই এবং দেশের সবাই যেমন জানে যে, গণদেবরা কারাগারে বন্দী রয়েছে। ওদের চেহারাগুলো একটু অন্যরকম হয়ে গেছে এই যা! একে গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে, তার ওপর বন্দী থাকার দুঃখ! অন্যরকম হবে না? হবেই তো!

বারো

সুবর্ণদ্বীপে পড়ে গেছে সাজো-সাজো রব। সারা দেশটাকে উৎসবের সাজে সাজানো গোছান চলছে। পথে পথে তোরণ, ফুলের মালা, রাস্তায় রাস্তায় সারবন্দী নানারঙের পতাকা, বাড়িতে বাড়িতে নানা রঙের আলো। রাজধানীর সোনার চুড়োওলা বাড়িগুলোর কত সাজের ঘটা। হাতির দাঁতের ওপরে সোনার কাজ করা দরজা-জানলায় সোনার পিদিম জ্বলছে সন্ধ্যেবেলায়, নানা রঙের কাপড়ের শিক্‌লি ঝুলছে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি পর্যন্ত, পথের এদিক থেকে ওদিকে, এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত বাড়িতে বাড়িতে রোশনচৌকি বসে গেছে,— মিঠে মিঠে সুরে সানাই বাজছে। কি ব্যাপার? না, রাজকন্যা মণি-দীপা সারা দেশ ঘুরে, গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের মনের কথা বলে, তাদের শান্ত করে, রাজপ্রাসাদে ফিরছেন।

মহাপরাক্রান্ত মকরকুমার, কুবেরজিৎ আর মার্তণ্ড সিংয়ের আনন্দ আর ধরে না। হাসিতে ঠাট্টায়, কথাবার্তায়, আমোদ আহ্লাদে, গল্পগুজবে তাদের আনন্দ যেন উপচে-উপচে পড়ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ কি? ছোট রাজাদের স্নেহের বোন ঘরে ফিরছে বলে? না, অতটা মনে না করাই ভাল।

আসল কারণ হল এই যে, রাজকন্যা তাদের মনের মতন কাজ করেছে; অন্ততঃ তারা তাই মনে করছে। কি কাজ? সারা দেশটা যে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, খাজনা ও শস্য দেয়া বন্ধ করেছিল, ছোট রাজাদের মানবে না বলে বিদ্রোহ করেছিল, তা শান্ত করেছে রাজকন্যা। রাজকোষের টাকা ফুরিয়ে গেছে কিছুদিন আগেই। এখন দামী দামী জিনিসের বদলে বিদেশ থেকে টাকা এনে চলছে। দেনার দায়ে দেশটার সবকিছু সম্পদ বিক্রি হয়ে যাবার আর দেরি নেই। রাজপুত্ররা একুশ রকমের ব্যঞ্জন, মাছ মাংস দিয়ে সোনার থালায় ভাত খেত। অত

রকমের রান্নার ব্যবস্থা উঠে গেছল। টাকার অভাবে মাত্র বারো রকমের পদ দিয়ে রুপোর থালায় তারা কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে আধপেটা খেয়ে উঠে যাচ্ছিল। ওদের মনের দুঃখের আর শেষ ছিল না। চার রকমের পায়েসের বদলে মাত্র এক রকমের পায়েস। মণ্ডা-মেঠাই, দই-সন্দেশ, রাবড়ি সবই কমে গেল। রাজবাড়ির চারদিকে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল বললেই হয়! হবেই তো! রাজবাড়ির কর্মচারী দাসদাসী, পরিচারিকা, নর্তকী, প্রহরী সকলেরই তো নানা রকমের খাওয়াদাওয়া করা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এখন বারো রকমে কি তাদের আশ মেটে? চারদিকেই দীর্ঘশ্বাস। ঝি-চাকরেরা বলাবলি করতে লাগল—আমাদের এই দুঃখকষ্টের দিন কবে শেষ হবে? শরীর যে সব শুকিয়ে গেল। বাগানে সে ফুলের মেলা আর নেই! কে অত যত্ন করবে? বারো রকমের তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে মালীরা কি ঠিক মতন কাজ করতে পারে, না করতে ইচ্ছে যায় তাদের? পশুপাখিদের অবস্থাও তেমনি। তারা ভাল খেতে পায় না বলে সুন্দর করে ডাকে না, গান করে না। রাজকন্যা লক্ষ্মী নেই বলেই যেন সব লক্ষ্মীছাড়া। এমন কি বড়রানী মেজরানী পর্যন্ত বলাবলি করছিলেন—যাই বলো বাপু, ছোটরানী যতই দেমাকে হোক, যতই খারাপ হোক, মণিদীপা মেয়েটা সত্যিই লক্ষ্মী! সতীনের মেয়ে হলেও সত্যিকথা বলতেই হবে। যেদিন থেকে তার মুখে হাসি নেই, সেইদিন থেকেই রাজ্যের এই হতশ্রী অবস্থা। যেদিন সে রাজবাড়ি ছেড়ে গেছে, সেইদিন থেকে সবকিছু যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। সবেরই অভাব হচ্ছে। ঠেকারে ছোটরানীকে আমরা দেখতে পারি না; তাই বলে মেয়েটার কি দোষ? মেয়েটা বড় ভাল। দোষের মধ্যে সে ছোটলোকদের বেশি ভালবাসে। আহা, তবু সে ফিরে আসুক, আমাদের সুখ হোক।

মন্ত্রী আর রাজকুমারদের মতন তাঁরাও মনে করছেন—এ অবস্থা আর থাকবে না। রাজকন্যা এলে তার নাম করে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেই আনন্দে সবাই বিভোর।

খবর এসেছে রাজকন্যার কাছে দেশের লোক খাজনা, শস্য—জমা দিয়েছে। সেই করের টাকা, জিনিসপত্র, সোনাদানা, নানা উপহার আর শস্য-বোঝাই গাড়িগুলো সারবন্দী হয়ে রাজকন্যার আগে আগে আসছে। কিছু গাড়ি আগেই এসে রাজপ্রাসাদের পেছনের দুর্গের শেষ ফটকে এসে ঢুকছে। প্রতিদিনই দু'তিন চার গাড়ি সোনাদানাও আসছে। কি করে বোঝা যাচ্ছে না রাজবাড়ির খাবারদাবারগুলো হচ্ছে, কাজকর্ম ঘষামাজা চলছে। রাজবাড়ির শ্রী ফিরে আসছে। সবাই হাঁফ ছেড়ে কাজে লেগে গেছে। আজ পনেরো রকমের তরকারি তো কাল ষোলো রকমের এই ভাবে ভাল ব্যবস্থা করে। কাজে সকলের সেকি উৎসাহ! বাগানে আবার ফুল ফুটতে লাগল, পাখিরা ডাকতে লাগল, গান করতে লাগল। মিইয়ে পড়া সানাই কেমন সুন্দর করে বাজতে লাগল। এটা কয়েকদিন আগের ঘটনা। এখন তো সারা রাজ্যে চলেছে উৎসব। তাই সকলের এত আনন্দ। উহুঁ, শুধু এই জন্যেই রাজবাড়িতে আনন্দ উপচে পড়ছে না, অন্য কারণও আছে। রাজকন্যা আর একটা খবর পাঠিয়েছে রাজপুত্রদের কাছে। রাজকন্যা বলেছে সে তার ভুল শুধরে নেব। রাজপুত্ররা যেন পূর্ণিমার দিন নতুন করে স্বয়ংবর সভা ডাকে। সে স্বয়ংবরা হবে। তবে তার অঙ্গীকার মত, প্রতিজ্ঞা মত, দেশের সবাইকে যেন সেই সভায় নেমন্তন্ন করা হয়। তাহলে তার বিয়ে করতে কোনো বাধা নেই।

এই! এ তো সামান্য আবদার! রাজপুত্ররা আহ্লাদে থুড়িলাফ খেতে লাগল। যাক! এতদিনে আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

মহামন্ত্রীকে ডেকে দ্বীপে দ্বীপে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে, নিমন্ত্রণ পাঠাতে বলল ছোটরাজারা। যত দেশ থেকে রাজারাজড়ারা আসবে ততই লাভ। তাঁরা এসে লাখ লাখ মোহর খরচ করবে, দেশের জিনিসপত্র কিনবে। তারপরে নিশ্চয়ই এক বিরাট প্রতাপশালী রাজপুত্রের গলাতেই মালা দেবে মণিদীপা। তখন কত সাহায্য পাবে মণিদীপার

শ্বশুরবাড়ি থেকে। সেই রাজার সাহায্যে সসাগরা পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারবে তারা।

ভাবনা কি? ডাকো, সাধারণ মানুষদেরও ডাকো। তাদের বড্ড মারধোর করা হয়েছে। ওরা প্রজা, ডানপিটে ছেলের মতন! ওদের একবার মারধোর করতে হয়, আবার পরে একটু আদর-টাদর করে দিতে হয়, তাহলেই খুশিতে গলে পড়ে ওরা। ওরা খারাপ কিছু মনে রাখতে পারে না। খেতে পরতে পেলেই হল। প্রজা মানেই বোকা, কিংবা গাধা। অভিধানে অন্ততঃ ঐ মানেই করা উচিত। কারণ করের বোঝা বয়, গাধার খাটুনি খাটে—ওরা গাধার মতনই। ডাকো, ডাকো ওদের। এখন ডাকতে তো আর ভয় নেই। আসল শয়তানগুলোকে তো খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। মুস্‌কো, হামদো সেই গুণ্ডাগুলো তো কারাগারে পচছে। তা হলে ভয়টা কাকে? রইল কে? ডাকো. ডাকো। তাছাড়া ডাকাটা তো কথার কথা। রাজকন্যা প্রায়শ্চিত্ত করেছে। বলেছে ভুল বুঝতে পেরেছে সে। তবে কথা দিয়েছিল, প্রতিজ্ঞা করেছিল, সাধারণ মানুষকে না ডাকলে সে কারুকেই মালা দেবে না, তাই তার মুখের কথাটাকে রক্ষার জন্যেই সবাইকে ডাকা। আর ডাকছ যখন ভালভাবেই ডাকো। মুখের কথা বলতে তো আর খরচ নেই—তাহলে ভাল-ভাল কথা বলে দিতে দোষটা কি? দাও বলে। প্রজারা আবার ভাল কথায় বিশ্বাস করে, বড্ড ভোলে। ওটা ওদের স্বভাবই বলো, রোগই বলো, দোষই বলো, আর গুণই বলো—যাই বলো না কেন!

গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে নেমন্তন্ন হল। মোড়লদের কাছে নেমন্তন্নের চিঠি গেল। সবাই এস। এ সোনার দেশ তোমাদের, রাজকন্যা তোমাদেরই। তার স্বয়ংবর সভায় তোমরা বাদ যেতে পার না। কারণ তোমাদের নিয়েই তো রাজত্ব। তোমরা কাজ কর, ফসল ফলাও বলেই রাজত্ব চলে। দেশরক্ষার জন্যে তোমরাই তো সৈন্য যোগাও, প্রাণ দাও! এই সব ভাল কথা লেখা চিঠি গেল।

আর তাই সারা দেশে পড়ে গেল সাজো সাজো রব। যেন মহোৎসব লেগেছে। তাই এত ফুল, এত রঙ, এত পতাকা, এত হাসি-গান, এত আনন্দ। সারা রাজ্যে হাসির ফোয়ারা উঠছে, খুশির ঝরনা বইছে!

এদিকে রাজকন্যা ফিরছে। সে এক ফেরা বটে! দশ-বিশ-পঞ্চাশ একশোটা দেশ জয় করে, দিগ্বিজয় করে ফেরাও এমন হতে দেখেনি কেউ সাত জন্মে!

এমন জাঁকজমকও কেউ দেখেনি কোথাও। সেগুনবনী গ্রামের লোকেরা এক বিরাট সেগুন কাঠের রথ তৈরি করেছে। রথটাকে সোনা-রুপোয় মোড়া হয়েছে। তারপরে সেটাকে ফুল, পাতা, মুক্তো-চুনী-পান্না দিয়ে সাজানো হয়েছে। বারোটা ঘোড়ায় টানছে সেই রথটাকে। সাতটা বড় বড় গ্রামের সাতটা ছেলে সেই ঘোড়াগুলোকে চালাচ্ছে। তবে তাদের বেশি কিছু করতে হচ্ছে না।

সুবর্ণদ্বীপের প্রতিটি গ্রামের একশো জন করে ছেলে সেই রথের আগে-পেছনে বিশাল শোভাযাত্রা করে চলেছে। তারা একটু করে হাত দিলেই রথ চলছে গড় গড় করে। ঘোড়াদের টানতেই হচ্ছে না প্রায়। যে গ্রাম-নগরের মধ্যে দিয়ে রথ যাচ্ছে, সেই গ্রাম বা নগরের হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ির সংসার ছেড়ে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিচ্ছে।

তিন ক্রোশ জুড়ে চলেছে শোভাযাত্রা। অজগর শোভাযাত্রা। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে তাদের। পথের দু'ধারের বাড়ি থেকে ফুল আর সুগন্ধী জল ছড়ানো হচ্ছে রাজকন্যার ওপরে।

শাঁখ বাজছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে—উলু-উলু-উলু-উলু।

এদিকে দেশ-বিদেশের রাজারা, রাজপুত্ররা পড়ি-কি-মরি করে একদল করে সৈন্য নিয়ে সুবর্ণদ্বীপের রাজধানীর দিকে দৌড় দিয়েছে। রাজকন্যা যদি মালাটা দেয় এই আশায়। তাহলে তার মতন ভাগ্যবান রাজপুত্র কি আর ত্রিভুবনে থাকবে কোথাও!

কিন্তু তারা এগুতে পারে না। প্রত্যেকটি রাস্তায় বিরাট বিরাট মানুষের মিছিল তাদের পথ আটকায়—রথ, ঘোড়া সবই অচল হয়ে যায়। রাজপুত্ররা আঙুল কামড়ায়, চুল ছেঁড়ে! ইস্-দেরি হয়ে যাচ্ছে! আগে-ভাগে গিয়ে স্বয়ংবর সভার প্রথম দিকে বসতে পারলে প্রথমেই রাজকন্যার চোখে পড়তে পারা যেত। তারা হাঁ করে শোভাযাত্রা দেখে। কেউ কেউ রথের ওপরে রাজকন্যাকে দেখে হতবাক হয়ে যায়। তাদের সৈন্যবাহিনীকে বিরাট উত্তাল সমুদ্রে ছোট ছোট আগাছার মতন মনে হয়। সব রাজপুত্রদেরই একই অবস্থা। হবে না কেন, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব দিক থেকেই যে সাধারণ মানুষের বিরাট মিছিল করে এগুচ্ছে আগে থেকেই। সে যেন এক বিরাট দৌড়-প্রতিযোগিতা। রাজধানীর মুখেই, গড়ের প্রধান সিংদরজায় দেখা গেল মকরকুমার কুবেরজিৎ আর মহামন্ত্রীকে। তাঁদের সঙ্গে ছোটখাটো একটা সৈন্যদল। তাঁরা এসেছেন মণিদীপাকে অভ্যর্থনা করতে। রাজকন্যা সিংদরজায় পৌঁছলে তারা তাঁর কপালে চন্দনের টিপ আর গলায় বকুল ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা করল। রাজকন্যা দাদাদের প্রণাম করল। তারা ওকে আদর আর আশীর্বাদ করে কত কথা বলতে লাগল।

--তুই যে এমন ভাল মেয়ে মণিদীপা তা আগে বুঝিনি। তুই ভুল করেছিলি, আমরা আরো ভুল করেছিলাম। যাই হোক ভুলটা সকলেরই ভেঙেছে এইটেই যথেষ্ট। পুরোন কথা ভুলে যারে লক্ষ্মী বোন্!—মকরকুমার বলল। তোর পরিবর্তন দেখে আমাদের আনন্দের সীমা নেই রে লক্ষ্মী! কুবেরজিৎ বলল, একটা অভিশাপ, একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল—উফ্।

—তুমি রাজাধিরাজ ধনপতি সিংহ বাহাদুরের উপযুক্ত কন্যার কাজই করেছ, মা! রাজ্যরক্ষা করেছ—সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, বাঁচিয়ে দিয়েছ। মহামন্ত্রী বললেন।

রাজকন্যা মৃদু হাসলেন। হাতজোড় করে বললেন, আশীর্বাদ করুন আমাদের এই মিল যেন অক্ষয় হয়! রাজ্যের ভাল ছাড়া আমি যে অন্য কোনো চিন্তাই করি না। আবার যেন ভুল না বোঝে কেউ।

মহামন্ত্রী ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—তাই হবে লক্ষ্মী মা!

এরপরে মহানন্দে কথা বলতে বলতে ওরা নতুন করে বিশেষভাবে তৈরি বিরাট রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হল।

রাজবাড়িতে আনন্দের ধূম পড়ে গেছে সবাই শাঁখ বাজাচ্ছে উলু দিচ্ছে, বাজনা বাজাচ্ছে—সে এক উৎসব—। শেষে মাঙ্গলিক গীত শুরু হল।

রাজকন্যা হাত তুলে সবাইকে বসতে বলে রাজবাড়িতে গেল। সহচরীরা, দাসদাসীরা, কর্মচারীরা সবাই তাকে হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা কবল, রাজকন্যা সোজা বড়রানীর মহলে গেল। গিয়ে দেখল যে বড়রানী আর মেজরানী বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা রাজকন্যাকে খুব আদর করলেন। রাজকন্যা ওঁদের প্রণাম করল, কুমাররা ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। একটু কথাবার্তার পরে রাজকন্যা জিজ্ঞেস করল—বাবামশাই আসেন নি? মা কোথায়?

রাজপুত্ররা শশব্যস্ত হয়ে বলল—মহারাজ খুব অসুস্থ তো! তার ওপরে নীলমুকুট পাহাড়ের নির্জন চূড়োয় উনি তপস্যা করছেন। উনি নিজে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন, আদেশ পাঠিয়েছেন। বলেছেন, স্বয়ংবর-সভা করতে। ছমাস পরে উনি এসে আশীর্বাদ করবেন। বলেছেন, তাঁর আদেশ যেন মানা হয়। আর ছোটমা ওঁর সঙ্গেই থাকবেন ঠিক করেছেন উনিও সেই সময়ে আসবেন। পূর্বাঞ্চলের প্রধান সেনাপতি মহাবীর সিংহবিক্রম সিংহ তাঁর আদেশ নিজে বয়ে এনেছেন।

রাজকন্যা সব শুনে ম্লান হাসি হাসল। বলল, বেশ, তাই হবে! ওঁর আদেশ মাথায় করে নিলাম। চল স্বয়ংবর সভায়। যেই না এ-কথা বলা অমনি চারদিকে শাঁখ বেজে উঠল। রাজকন্যা সকলের সঙ্গে স্বয়ংবর সভার দিকে ধীরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। রাজবাড়ির সবাই তাকে ঘিরে নিয়ে চলল।

তেরো

বিরাট বিশাল সমুদ্রের মতন স্বয়ংবর-সভা বসেছে। কাতারে কাতারে লোক এসেছে এবং আসছে। শুধু মাথা আর মাথা—মাথার সমুদ্র, পাগড়ির সমুদ্র! শিরস্ত্রাণের, মুকুটের ঢেউ মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সেই সমুদ্রে। দেশের সাধারণ মানুষেরা শোভাযাত্রা করে এসে সভার সামনের দিকটা অধিকার করে বসেছে। এমন একতিল জায়গা নেই, এমন একছুঁচ ফাঁক নেই যে বিদেশী রাজপুত্ররা তার মধ্যে ঢুকে বসে বা দাঁড়ায়—। কাজেই তারা সবাই ঐ ভিড়ের বাইরে বসে বসে মানুষের মাথার ঢেউ গুনতে লাগল। কি আর করবে? তখন রাজকুমারদের কাছে খবর গেল বিদেশী অতিথিরা রাজসভার ভেতরে ঢুকতেই পারছেন না।

শুনে মকরকুমার কুবেরজিৎ আর মহামন্ত্রী মার্তণ্ড সিং এক এক করে ওদের বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ, তোমরা দেশের মানুষ! বিদেশী অতিথিদের আগে বসতে দাও! তা না হলে রাজ্যের বদনাম হবে, তোমাদেরও নিন্দে হবে!

কিন্তু কে আর ওদের কথা শোনে! তারা কেউ রাজকুমারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে মহামন্ত্রীর হাঁকডাকে কানই দিল না।

শেষে রাজকন্যার কাছে গিয়ে কুবেরজিৎ সাতখানা করে লাগাল। শেষে বলল,—দেশের লোকেরা সব মাথায় উঠে গেছে রে লক্ষ্মী! একটু সামলে চলিস বোন! ওরা বলে কি জানিস, বলে—এটা স্বয়ংবর সভা! আমরা সবাই নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছি। যে আগে আসবে সে আগে বসবে! সবাই সমান সম্মান পাবে!

সব শুনে রাজকন্যা বৈদ্যশাস্ত্রী আর পুণ্যব্রতকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। ওরা ছুটে গিয়ে বোঝালেন, ভাইসব। তোমরা সবাই সমান। তবে বিদেশীরা তেমোদের অতিথি। ওদের আগে বসতে দেয়া আমাদের ধর্ম ;

রাজকন্যা লক্ষ্মীর ইচ্ছে তোমরা আগে ওদের বসতে দাও। কথাগুলো মন্ত্রের মতন কাজ করল। গ্রামের লোকেরা মাথা নাড়ল—ই ল্যাঝ্য কথা বটে হে চল হে সরে বসিগা ! লারবক্ বইললে চলবেক্ লাই !

কিছুক্ষণের মধ্যে সব্বাই সরে সরে গিয়ে প্রথম দিকের বেশ খানিকটা জায়গা খালি করে দিল। আসনগুলো খালি করে দিল। তাতে অতিথি রাজপুত্রদের এনে বসিয়ে দিল। শেষে বসল দেশের মানুষ। যেন যাদুকরের যাদুদণ্ডে কাজ হয়ে গেল।

বাইরের অতিথি রাজপুত্ররা এবং ভেতরের গুণধর রাজকুমাররা অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। অত সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল দেখে আবার অনেকক্ষণ ধরে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল গুণধর রাজকুমাররা।

সভা শান্ত হয়ে গেল। থমথম করতে লাগল চারদিক। যেন গাছের পাতাটি নড়ছে না, চোখের পাতাটি পড়ছে না কারুর। এমন সময়ে রাজকন্যা মহামন্ত্রীকে তার কাছে যেতে বলল। মহামন্ত্রী আহ্লাদে আটখানা ল্যাজামুড়ো দশখানা হয়ে দৌড়ে গেলেন তার কাছে। রাজকন্যা ওড়নার আড়াল থেকে তাঁকে কিছু বলল, শেষে মকরকুমার আর কুবেরজিৎকে কাছে ডেকে আরো কি সব বলল। সব কথা শুনে রাজকুমারদের সঙ্গে পরামর্শ করে মহামন্ত্রী সভার সামনে এসে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—মাননীয় অতিথি রাজা-রাজপুত্রগণ, একটা ঘোষণা আছে—রাজাধিরাজ ধনপতি বাহাদুর রাজচক্রবর্তীর সর্বসুলক্ষণা কন্যা, সর্বগুণভূষিতা, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, আমাদের পরম আদরের, পরম শ্রদ্ধার, পরম সম্মানের, সুবর্ণদ্বীপ রাজ্যের মাথার মণি, লক্ষ্মী মণিদীপা এবারে স্বয়ংবরা হতে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর মনের মতন পুরুষের কপালে চন্দনের টিপ আর গলায় বকুল ফুলের মালা পরিয়ে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেবেন, তারপরে মহাধুমধামের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেয়া হবে।

রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বারোজন সহচরী, রাজকুমররা, গুরু বৈদ্যশাস্ত্রী, পরম শ্রদ্ধেয় পুণ্যব্রত শাস্ত্রী থাকবেন, পেছনে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেহরক্ষীরা যাবেন। আপনারা অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য ধরবেন, শান্ত থাকবেন। এবার রাজকন্যার আবেদনের কথাটা বলছি—আপনারা জানেন, এতজন অতিথি এবং নিমন্ত্রিত মানুষের মধ্যে রাজকন্যা একজনের গলাতেই মালা দেবেন। তার মানে এই নয় যে, রাজকন্যা অন্যদের অসম্মান করলেন, উপেক্ষা করলেন বা অপমান করলেন। কারণ সকলের গলাতে তো মালা দিয়ে বরণ করা সম্ভব নয়। তাই রাজকন্যার একান্ত অনুরোধ এই যে, যার গলাতেই তিনি মালা দিন না কেন, বাকিরা যেন সেটাকে আনন্দের সঙ্গে মেনে নেন। কেউ যেন ক্ষুব্ধ না হন, তাহলে রাজকন্যার ইচ্ছেটাকেই অপমান করা হবে। রাজকন্যা সকলকেই সমানভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। কিন্তু একজনকে তো বরণ করে নিতেই হবে। এই আবেদনে ও অনুরোধে আপনাদের মত আছে জানলে তিনি মালা হাতে সভায় নামবেন। অতিথিরা, রাজা রাজপুত্ররা কথাগুলো শুনে একটু-আধটু ভেবে নিলেন, নড়েচড়ে বসলেন, মুকুট-পাগড়ি ঠিক করে নিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক আছে কিনা দেখে নিলেন এবং রেশমী রুমালে মুখগুলো মুছে নিলেন। ছোট ছোট আয়না বার করে মুখগুলো দেখে নিলেন। গোঁফগুলোকে চুমরে কেউ বা ধনুকের মতন, কেউ বা তলোয়ারের মতন, কেউ বা টাঙ্গির ফলার মতন, কেউ বা প্রজাপতির মতন, কেউ বা দুটো মুড়ো ঝাঁটার মতর করে নিলেন। জুলপিগুলোকে কেউ সোজা করে দিলেন, কেউ বা এলোমেলো করে দিয়েটিয়ে—প্রত্যেকেই ভাবতে লাগলেন তাঁর মতন সুন্দর কেউ নেই অতএব, সুতরাং রাজকন্যা তাঁর গলাতেই—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে টুক করে ভেবে নিলেন সব্বাই, কেমন করে রাজকন্যাকে নিয়ে রথে চড়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে দেশে ফিরবেন—কেমন করে

বিবাহ উৎসব করবেন ; কেমন করে নিজের রাজ্যের সিংহাসনে রাজ-কন্যাকে পাশে নিয়ে সগর্বে বসবেন। আরো ভেবে নিতে ভুললেন না, বন্ধু রাজারা কেমন কালিমুখ করে হিংসের চোখে তাকিয়ে থাকবেন তাদের দিকে! তাঁর সৌভাগ্য দেখে জ্বলে-পুড়ে মরবেন! কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। বেচারীরা এই সব ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন, হয়েছিলেন অন্যমনস্ক। এমন সময়ে একটা হৈ-হৈ, রৈ-রৈ শব্দ উঠতেই চমকে উঠলেন সবাই। শুনলেন, দেশের মানুষজন রাজকন্যার আবেদনে সম্মতি জানাচ্ছে। আমাদের মতটি আছে বটেগো বড় মোড়ল! আমরা রাজী বটেগো! রাজকন্যে যা বইলবেন, আমাদের তাই মতটি জানবেক।

উনি দেবতা বটেন হে !!

এই সব কথা শুনে ওঁরা কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। চুপ করে থাকাই ভাল। যা গোলমাল! কেই বা শুনছে ওঁদের কথা। সমুদ্র যখন ঝড়ে মেতে উঠে তর্জন-গর্জন করে, তখন ব্যাঙের ডাক কি কেউ শুনতে পায়?

কিছুক্ষণের মধ্যে সভা আবার শান্ত হয়ে গেল। তখন রাজকুমার কুবেরজিৎ অতিথি রাজাদের দিকে তাকিয়ে বলল, অনুগ্রহ করে আপনারা মত দিন। তা না হলে রাজকন্যা সভায় নামতে পারছেন না।

এই কথা শোনার পর আর চুপ করে থাকা যায়? অতিথিরা সবাই হাত তুলে বললেন আমাদের মত আছে, সম্মতি আছে। রাজকন্যার ইচ্ছাকে আমরা সম্মান দেব।

এই সব কথায় বৈদ্যশাস্ত্রী আর পুণ্যব্রত শাস্ত্রীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আর সভার পেছন দিকের একটা জায়গায় হাসির ঢেউ উঠল। রাজকুমাররা, মহামন্ত্রী ও সেনাপতিরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, ফস্-ফস্, ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে।

তারপরে মহামন্ত্রী বললেন তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে রূপেগুণে সাক্ষাৎ-লক্ষ্মী মণিদীপা তাঁর উপযুক্ত স্বামী বরণ করে নেবার জন্যে সভায় পদার্পণ করছেন!

—আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়! রাজ্যের প্রজারা বলল।

—করুন, করুন—! অতিথি রাজপুত্ররা বলে উঠলেন। কিন্তু তাঁদেব গলার স্বর কেমন যেন করুণ শোনালো।

তখন শাঁখ বেজে উঠল পোঁ—পোঁ—পোঁ—ওও—পুঁয়াক্—করে। তারপরেই বেজে উঠল নানান বাজনা। সেই বাজনার তালে তালে একদল সখী নাচতে-নাচতে এগিয়ে এল, আর তাদের পেছনে সহচরীদের সঙ্গে ধীর পায়ে কিন্তু ঠিক তালে পা ফেলে ফেলে নেমে এল রাজকন্যা মণিদীপা। আহা, স্বর্গ থেকে যেন বিদ্যেধরী সরস্বতী লক্ষ্মী এক অঙ্গে একাকার হয়ে নেমে সকলের চোখ জুড়িয়ে দিল।

ঘন মাখন-রঙের রেশমের শাড়ি তার গায়ে, শাড়ির পাড় পোড়া লাল রঙের, রুক্ষ রেশমের এলচুল তার হাঁটু ছাড়িয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেছে সারা পিঠ ঢেকে। পিঠ দিয়ে যেন রেশমের প্রপাত নেমেছে। কপালে চন্দনের টিপ। গায়ে কোনো গয়না নেই। গয়না থাকলে সেগুলোকে বিশ্রী লাগত, রাজকন্যাকেও বেমানান ঠেকত। তার স্বাভাবিক রূপ আর সৌন্দর্যটাই নষ্ট হয়ে যেত, ঢাকা পড়ে যেত।

সভাসুদ্ধু সবাই বলে উঠল—আহ্! বাঃ! কি সুন্দর! মরি—মরি—! এমন সময়ে বাজনা থেমে গেল। বিয়ের সানাই বাজতে লাগল মৃদুস্বরে। রাজকন্যা এগিয়ে চলল। ওপর থেকে মহামন্ত্রী আবার ঘোষণা করলেন—রাজকন্যা প্রথমে সবাইকে দেখে অভ্যর্থনা জানাবেন, তারপরে মনস্থির করে আবার একবার সভা প্রদাক্ষিণ করতে করতে তাঁর মনের মতন পুরুষের গলায় মালা দেবেন। প্রথম বারে আপনাকে বা আপনাদের পেরিয়ে চলে গেলে হতাশ হবেন না যেন। ধৈর্য ধরুন।

রাজপুত্ররা সবাই প্রাণপণে ধৈর্যটা ঠিক কোথায় থাকে না জেনে—নিজেদের ডানহাতগুলোকে বাঁ হাত দিয়ে কষে চেপে ধরে বসে রইলেন। রাজকন্যা একটু একটু করে এগিয়ে চলল। প্রথমে রাজা-রাজপুত্রদের

স্বাগত জানিয়ে, নমস্কার জানিয়ে এগুতে লাগলেন। সে যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তাঁর একজন সহচর তাঁর পরিচয় বলতে থাকে তোতা-পাখির মতন। রাজা-রাজপুত্রদের নাম-ধাম। রাজ্যের এলাকা, শৌর্য-বীর্য, বংশগৌরব, সম্পদ, বিদ্যে-বুদ্ধি প্রভৃতির কথা গড়গড় করে বলে যায়। রাজকন্যাও তাকিয়ে তাঁকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করে। তার প্রধান সহচরী সঙ্গে সঙ্গে নামধাম লিখে নেয়।

এই অতিথিদের প্রদক্ষিণ করে রাজকন্যা প্রজাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। তারা তাকে তাদের এত কাছে পেয়ে খুশিতে টইটুম্বুর। সবাই তাকে নমস্কার করে হেসে তার জয়ধ্বনি করে। তাদের সারিতে অনেকক্ষণ পরে পরিক্রমা শেষ করে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যেখানে বসেছেন, অন্যান্য সভাসদরা যেখানে বসেছেন, রাজকন্য সেখানে গেল। তাঁদের সংবর্ধনা জানিয়ে আবার চলল সভার শেষে যেখানে একদল সন্ন্যাসী সেবাব্রতী বসে আছেন। রাজকুমাররা বলে উঠল ওখানে কি? ওঁরা তো সন্ন্যাসী।

রাজকন্যা কথা না বলে এগিয়ে চলল। মকরকুমার আর কুবের-জিৎ ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটু দূরে।

শেষ সারিতে বসে আছেন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীর দল। তাদের ঘন কালো দাড়ি, মাথায় রুক্ষ জটিল-জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, যেন কালো কুচকুচে পাথরে কোঁদা শরীর, তাতে আবার ছাই মাখা।

সবাই কৌতুক বোধ করছে, আমোদ পাচ্ছে। বলছে, উদিকে কেন? অতিথি রাজারা ভাবছেন—সময় নষ্ট করছেন কেন রাজকন্যা? এদিকে চলে এলেই তো হয় এবার।

রাজকন্যা সেই সেবাব্রতী সন্ন্যাসীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ধীর পায়ে। ওঁরা হেসে অভ্যর্থনা করলেন ওকে। সভায় সকলের ঘাড় এদিকে ফেরানো। সকলেই ভাবছে উনি ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন আবার? একি অভিনয়!

এদিকে রাজকন্যা প্রধান সহচরীর কানে কানে কি বলল যেন। সহচরী সন্ন্যাসীদের বলল আপনাদের পরিচয় দিন। শুনে ওঁদের একজন বললেন, আমরা বৈদ্যশাস্ত্রীর শিষ্য—সন্ন্যাসী, সেবাব্রতী।

রাজকন্যা মৃদু হেসে তবু একটু-একটু করে এগোয় আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

প্রত্যেককে মৃদুস্বরে কি যেন সব জিজ্ঞেস করে। শেষে ঠিক ওদের মাঝখানে গিয়ে দেখল যে, ষোলজন সন্ন্যাসী এক জায়গায় বসে আছেন। তাঁরা যেন একটু অন্য রকমের। রাজকন্যা, তাঁদের ঠিক মাঝখানে যিনি বসে আছেন তাঁকে দেখিয়ে সহচরীকে ইঙ্গিত করল—ওঁর পরিচয় চাও।

সহচরী বলল—নবীন সন্ন্যাসী, আপনার পরিচয় দিন।

সন্ন্যাসী—সেবাব্রতী, বৈদ্যশাস্ত্রীর শিষ্য, পুণ্যব্রতশাস্ত্রীর ছাত্র। এখন আর অন্য পরিচয় নেই।

সহচরী—তবু, আপনার নাম-ধাম?

সন্ন্যাসী—নাম ধাম ভুলে কাজ করাই আমাদের দীক্ষা!

সহচরী—আপনি কি সংসার ত্যাগ করেছেন? বা করবেন?

সন্ন্যাসী—না।

সহচরী—তবে কেন নাম বলবেন না। রাজকন্যার এই সভায় নাম-ধাম বলা নিয়ম।

সন্ন্যাসী কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না দেখে বৈদ্যশাস্ত্রী এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, এ সভায় নাম-ধাম বলতে বাধা নেই, বাধ্যতা আছে বরং। বলে দাও। আচ্ছা, আচ্ছা! মালতী, ওর পরিচয়টা আমিই দিচ্ছি। ওর নাম—গণদেব মাঝি। চাষী-মাঝির ছেলে। বাবার নাম হরদেব মাঝি। বাসমতী গ্রামে ওর বাড়ি। ওর মতন শক্তিশালী, সর্বজনপ্রিয় নেতা এ রাজ্যে আর নেই। দক্ষ-শিকারী, অপরাজেয় সাঁতারু, নৌচালক, আবার চাষবাসে অসাধারণ কর্মী,

মানুষের সেবায় প্রাণপণ করেছে ও, ওর ক্লান্তি নেই মানুষের সেবা-কাজে। ও অনন্যসাধারণ, সকলের প্রিয়, সকলের শ্রদ্ধেয়।

শুনতে শুনতে রাজকন্যা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল। ও কি ক্লান্ত? ওর কি মাথা ঘুরছে? সহচরী ধরে ফেলল। নিজেকে সামলে নিয়ে কেমন যেন কাঁপতে কাঁপতে রাজকন্যা হঠাৎ সোনার বাটি থেকে চুয়া-চন্দন নিয়ে গণদেবের কপালে ঠেকিয়ে, তাড়াতাড়ি ওর ঝাঁকড়া চুলের ওপর দিয়ে বকুল ফুলের মালাটি ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা আকাশ-ফাটা আনন্দধ্বনি তুলল—রাজকন্যার জয়! লক্ষ্মীর জয়! গণদেবের জয়!! সুবর্ণদ্বীপের জয়!! দেশের মানুষের জয়!! গুরুজীর জয়!—কি সুন্দর দেখাচ্ছে হে! দুগ্‌গাঠাকুর যেন নতুন করে শিবঠাকুরের গলায় মালাটি দিলেক হে!—

একজন গ্রামবাসী বলল:

—আর সিটি দেকার জন্যে বেঁচ্যে আচি হে! কি যে ভাগ্যটি! বইলতে লারবক্, আরে পেরানটি মনটি জুড়ায়ে গেলোক হে!—

এদিকে যখন আনন্দের হর্‌রা ছুটছে, ওদিকে তখন লেগেছে দারুণ, ভীষণ গোলমাল!

দুই রাজকুমার, মহামন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে করে তেড়ে এসেছে।

—একি করছিস লক্ষ্মী! মকরকুমার চটে বোম হয়ে বলল—যা নিয়ম তাই করবি তো? কে এক সন্ন্যাসী, তাকে মালা দিলি? ভবিষ্যৎ ভেবেছিস? ও কি সংসার করবে, সুখী করবে? মালা ফিরিয়ে নে—ফিরিয়ে নে! শীগগির নে! দাঁড়া আমি নিচ্ছি!—

মকরকুমার এগিয়ে যেতেই পুণ্যব্রত আর তার সহচরেরা বাধা দিল—দাঁড়ান, আগে রাজকন্যা কি বলেন শুনুন, নিতে হয় রাজকন্যাই নেবেন! পুণ্যব্রত বললেন।

কুবেরজিৎ চিৎকার করে উঠল না না, এ কিছুতেই হতে দেব না!

যা খুশি করলেই হল! রাজবংশের একটা সম্মান নেই! এটাকে ভাঙতেই হবে! প্রধান সেনাপতি সৈন্যবাহিনীকে ডাকুন! একটা চরম কাণ্ড হোক! বিহিত হোক! প্রতিজ্ঞা! এ-বিয়ে ভাঙবই! —বলেই ওরা দৌড়ে গিয়ে অতিথি রাজপুত্রদের কাছে আগুনের ভাষায় কি সব বলল।

অতিথিরা শুনে হৈ হৈ করে বলল—বটে—বটে—বটে! তবে রে! এইবারে মজা টেরটি পাইয়ে দেব! এ বিয়ে কিছুতেই মেনে নেব না! নেমতন্ন করে এনে আমাদের অপমান! আসল শিকারকে আর হাত-ছাড়া করব না! যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ! ওদের চিৎকারে যোগ দিল সামন্ত সিংয়ের দলবল। রাজপুত্ররা ঝনাৎ-ঝনাৎ করে তলোয়ার খুলে ফেলল খাপ থেকে। রোদে তলোয়ারের আলো ঠিকরে দিয়ে, মাথার ওপর তলোয়ার তুলে চিৎকার করল সবাই—যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! হাজার হাজার লোককে টুকরো-টুকরো করে দেব। হাজার মুণ্ড নিয়ে খেলা করব! জয় রাজবংশের জয়!

এদিকে প্রধান সেনাপতি সিংহের মতন গর্জন করে আদেশ করলেন —সৈন্যদল! প্রস্তুত হও! সৈন্যদল চারদিক থেকে চাকার মতন ঘিরে এগিয়ে এল। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার—বল্লম-গদা-শূল প্রভৃতি হাজারো রকমের অস্ত্র।—কচুকাটা করো! রক্তের নদী বইয়ে দাও!

অতিথিরা তাদের সঙ্গে যে সৈন্যবাহিনী এনেছিল তাদের আদেশ দিল। সকাল শেষের রোদে ঐ সব ইস্পাতের অস্ত্রশস্ত্র এমন ঝলসে উঠল যে, মনে হতে লাগল যেন দুপুর হয়ে গেছে। তার ওপরে চিৎকার, আস্ফালন, সিংহনাদ! একটা ভয়ংকর রকমের কাণ্ড ঘটবে জেনে পৃথিবী যেন মুহূর্ত গুনতে লাগল!

এমন সময়ে দুই রাজকুমার মহামন্ত্রীকে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে মঞ্চে দাঁড়াল। কুবেরজিৎ চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগল। গোলমাল ও হৈ-হল্লায় কিছুই শোনা গেল না। তখন মহামন্ত্রী হাত তুলে সকলকে চুপ

করতে বলে, বলতে লাগলেন—আমাদের প্রিয় অনুগত প্রজারা, শুনুন ! সুবর্ণদ্বীপ রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক তাই কি চান আপনারা ? আপনাদের সংসারগুলো নষ্ট হোক, স্ত্রী-পুত্র খেতে না পেয়ে মরুক, তাই চান ? নিশ্চয়ই চান না ! তাহলে শান্ত হোন ! যে অন্যায়টা, ভুলটা হয়ে গেছে, তা শুধরে নিতে দিন। যা বলি সোনামুখ করে মেনে নিন্। বাড়ি ফিরতে চান না ! মা-বাবা-স্ত্রী এদের সঙ্গে আবার মিলিত হতে চান না ? ভেবে দেখুন। দেশী-বিদেশী দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী ভীষণ ক্ষেপে আছে ! আপনারা আমার কথা না শুনলে এখুনি একটা দারুণ হত্যাকাণ্ড হবে ! শিক্ষিত সৈন্যদলের কাছে যতবড়ই জনতা হোক দাঁড়াতে পারবে না। মনে রাখবেন—একজনও হয়তো বাড়ি ফিরতে পারবেন না আর।

এরপরে কুবেরজিৎ বলতে লাগল—ভাইসব ! শুনুন !—কয়েকজন কুচক্রী সন্ন্যাসীদের দিয়ে তুক্‌তাক, মন্ত্রতন্ত্র করে আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, আমাদের বোন রাজকন্যা মণিদীপাকে বশ করানো হয়েছে। সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এক নিঃস্ব সন্ন্যাসীর গলায় না জেনে মালা দিয়েছে ! কারণ আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন যে আমাদের বোন এর আগের বারেও একজন সাধারণ মানুষকেই বরণ করতে চেয়েছিল, সুযোগ ছিল না বলে সেবার স্বয়ংবর সভায় কাউকেই বরণ করেনি। সেই সৎ আদর্শ চরিত্রের মেয়ে কি করে আজ অন্য একজনকে বরণ করতে পারে ! আপনারাই ভেবে দেখুন ! ওকি আর নিজের মধ্যে আছে ? ওর মাথার ঠিক নেই ! ও এখন যন্ত্রের মতন, পুতুলের মতন। কোন মন্ত্রগুরু যা করাচ্ছেন, ও তাই করছে। আমরা সৎপথে থাকতে চাই, ওকে এমন অসৎ কাজ কিছুতেই করতে দিতে পারি না। তাই ঘোষণা করছি—রাজকন্যার বিয়ে অসিদ্ধ, বিয়ে ভেঙে গেল, কাটাকাটি হয়ে গেল ! ওকে আবার নতুন করে স্বয়ংবর সভায় নিয়ে আসব আমরা ! এখন আপনারা বলুন, এ-বিয়ে কেউ মানেন না আপনারা।

সঙ্গে সঙ্গে রাজ-অতিথিরা একগলায় বলল—ঠিক বলেছেন! মানি না, মানছি না—মানব না! দেওদার গ্রামের লোকেরাও তাই বলল। গণ্যমান্য অমাত্যরাও তাদের সুরে সুর মেলাল। মকরকুমার আর কুবেরজিতের মুখে হাসিটি ফুটতে যাবে এমন সময়ে সাধারণ মানুষেরা, প্রজারা বিশাল উত্তাল ঝোড়ো সমুদ্রের গর্জনের মত গর্জন করে উঠল—মিথ্যে, মিথ্যে! রাজপুত্র মিথ্যে বলছেন! রাজকন্যাই ঠিক! প্রাণ থাকতে এ- বিয়ে ভাঙতে দেব না আমরা!

রাজপুত্রদের হাসি কুঁড়িতেই ঝরে পড়ল। চোখ পাকিয়ে কুবেরজিৎ প্রধান সেনাপতির দিকে ইঙ্গিত করল, প্রধান সেনাপতি অন্য সেনাপতিদের ইঙ্গিত করলেন—তাঁরা সৈন্যদের কি যেন আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেঁপু বেজে উঠল। ভেঁপু শুনে খোলা তলোয়ার হাতে সৈন্যদল নিজেদের বৃত্তটাকে ছোট করে সভাটাকে ঘিরতে লাগল—চেপে আসতে লাগল জনতা চেঁচিয়ে উঠল—ঠিক আছে! আমরাও তৈরি! ভাই সব প্রস্তুত হও! যুদ্ধ যুদ্ধ—যুদ্ধ!

যুদ্ধ ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই, অন্যায়-অবিচার আর শোষণকে শেষ করার জন্যে যুদ্ধই করতে হয় শেষ পর্যন্ত।

কে একজন হেঁকে বললে, বার করে ফেল! সঙ্গে যে সব সাপ আর খেলনা আছে বার করে ফেল-ও-ও! খেলা হোক! প্রসতুত্! -

সঙ্গে সঙ্গে এক আজব কাণ্ড ঘটতে দেখা গেল। এক অদ্ভুত যাদু! এক ইন্দ্রজালের খেলা!

সুবর্ণদ্বীপের উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলের ব্যাধেরা ছিল সভার প্রথম কয়েকটা সারিতে। তারা দুর্ধর্ষ। পাথরের মতন তাদের শরীর। নানা রঙের হরিণের আর বাঘের ছালের পোশাক। হাতে-গলায় রঙীন পাথরের মালা। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুলে হীরামণ পাখির পালক গোঁজা। কপালে লাল গেরুয়া রঙের ছবি আঁকা। তাদের একজন সর্দার তিড়িং করে কাঙারুর মতন লাফ দিয়ে ছিটকে সভা-

মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়াল আর সঙ্গে তার সাপুড়ে বাঁশিতে গাল-গলা ফুলিয়ে দিল ফুঁ—। প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ! নেচে নেচে বাজাতে লাগল বাঁশি—প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ—প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ! আর ঠিক তখনই শুরু হয়ে গেল আসল যাদুর খেলাটা। শোভাযাত্রা করে আসার সময়ে সব প্রজাই হাতে এক-একখানা করে নিরীহ গোছের মোটা বাঁশের লাঠি এনেছিল, কেউ এনেছিল বাঁশের একটা টুকরো। বাঁশি বাজতেই সেই বাঁশগুলো যেন জ্যান্ত সাপের মতন হয়ে গেল। সব প্রজাই ঐসব বাঁশের ওপর দিকটায় হাত দিয়ে একটা করে হ্যাঁচকা টান দিল। টান দিতেই বাঁশের মাথার একটা অংশ টুপির মতন বা ঢাকনির মতন খুলে গেল। আর সেইসব বাঁশের ফাঁপা পেট থেকে বেরুতে লাগল সাপ— মানে অস্ত্রশস্ত্র! বল্লম, সড়কি, ক্যাঁচা, ধনুক, বাঁটুল, গুপ্তি, শূল, তলোয়ার, টাঙি। এইরকম ভয়ংকর ভয়ংকর অস্ত্র! পাহাড়ী ব্যাধরাই প্রথমে দেখাল খেলাটা। তাদের হাতের বাঁশের টুপি খুলতেই তার ভেতর থেকে একটুকরো তেল-চুকচুকে ব্যাখারি বেরুলো, বাঁশ চিরে-ছুলে তৈরি ব্যাখারি। তার সঙ্গে লাগানো এক চিল্‌তে চাঁছাছোলা বেত বা কঞ্চি। ব্যাখারিটাকে বারকয়েক বেঁকিয়ে তাতে বেতের ছিলাটা পরিয়ে দিল সবাই। চোখের নিমিষে সেগুলো ধনুক হয়ে গেল। কারুরগুলো হল বাঁটুল বা সাতনলী—যা দিয়ে পাথর ছোঁড়া যায়।

নিরীহ ব্যাখারিগুলো এক হাজার পাহাড়ীর হাতে হয়ে গেল এক হাজার ধনুক আর বাঁটুল! আরো আছে। বাঁশের খোপের মধ্যে থেকে বাঁধা দু-গুচ্ছ তীর বেরুল, তীরগুলোর ফলায় বিষ মাখানো, গায়ে একটু আঁচড়ে দিলেই শেষ! আর কিছু লোকের বাঁশের খোপ থেকে বেরুলো এক থলে পাথরের টুকরো, সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল— সাতনলী ছোঁড়ার জন্য তৈরি। আর তিন হাজার পাহাড়ীর বাঁশের ভেতর থেকে বেরুলো—গুপ্তি, ক্যাঁচা, বল্লম, সড়কি, টাঙি প্রভৃতি সব।

এক হাজার ধনুক আর বাঁটুল, আর চার হাজার সড়কি, বল্লম,

ক্যাচা, নিয়ে পাহাড়ীরা বাঁশির তালে তালে শুরু করে দিল যুদ্ধ-নৃত্য। সঙ্গে সঙ্গে মাদল বাজল, শিঙা বাজল। তারপরেই শুরু হল তাদের যুদ্ধের গান। সে এক আশ্চর্য গান, অদ্ভুত গান! ওরা রাজকুমারদের মন্ত্রীদের, রাজ-অতিথিদের ঘিরে গোল হয়ে নাচতে নাচতে গান ধরল। নানা রঙ-মাখা এক সর্দার বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ে গান শুরু করে দিল—

হে-ই, ধনুকধারী!
আ-য়, জোরসে কাঁড়ি!
ও-ই গিদ্ধোরই মারি,
লে- সাতনলী ছাড়ি—
লুফে, লুফ্‌ফে দুটো ময়ূর পাড়ি॥

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার পাহাড়ী অস্ত্র উঁচিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সর্দার দু-বার ঐটুকু গেয়ে কিছুক্ষণ নাচল, তারপরে আবার এক লাফ্ দিয়ে নতুন পংক্তি ধরল—

হে-ই গুপ্তিধারী,
ছা-ড় সুপ্তি ভারী
চ-ল সড়কি ঝাড়ি
তেড়ে-তেড়ড়ে দুটা শুয়োর মারি॥

গানের শেষের চরণে তীরের মতন চোখ দিয়ে রাজকুমারদের দিকে দেখিয়ে দেয় সর্দার। দু'বার ঐটুকু গেয়ে আবার এক লাফ দেয়। গুপ্তি উঁচিয়ে সর্দার রাজকুমারদের দিকে দেখায় আর গায়—

আ-রে-রে বল্লমধারী!
চ-ল জঙ্গল ফাড়ি!
হাঁকড়ে ক্যাঁচা গাড়ি,
গেঁথ্‌থে ছেঁচ্‌চে দুটো কেউটা মারি॥

নেচে নেচে পাঁচ হাজার পাহাড়ী গাইল—গেঁথ্‌থে ছেঁচ্‌চে দু'ভা কেউটা মারি! ততক্ষণে সমস্ত প্রজারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র বার করে

ফেলেছে। রাজ-অতিথিদের চোখগুলো পান্তুয়া হয়ে গেছে। রাজকুমাররা ঐসব ইঙ্গিত বুঝে রেগে আগুন, তেলেবেগুন। পাহাড়ীরা, প্রজারা তাদের টিট্‌কিরি করছে। এত অপমান, প্রাণ যায় তাও সই, এ অপমান কিছুতেই সইব না! মনে মনে এই ভেবে ওরাও লাফ্ দিয়ে প্রাসাদরক্ষীদের ইঙ্গিত করল—আক্রমণ কর! পাহাড়ী জংলীদের কেটে টুকরো-টুকরো করে দাও। সব্বাইকে শুয়োরমারা মারো! ইঙ্গিত শুনে প্রধান সেনাপতি ভয়ংকর বাজখাঁই গলায় আদেশ দিলেন—ঝাঁপিয়ে পড়! সাঁড়াশি আক্রমণ কর। এ-অভিযানের নাম—"অভিযান কচুকাটা!" সভার বিরাট জনতা, পাহাড়ীরা এমন কি বৈদ্যশাস্ত্রীরাও এতটা ভাবতে পারেন নি। ঐ বিরাট জনতার বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দিলে কিছু লোক কচুকাটা হবে ঠিকই, অনেক লোক মারা যাবে নিশ্চয়ই কিন্তু সৈন্যরাই বা কতক্ষণ থাকবে? মাঝ থেকে বহু লোক মিছিমিছি মারা পড়বে! সবাই ভেবেছিল রাজ্যের মানুষের একতা দেখে, মনের জোর দেখে রাজকুমাররা সামলে নেবে, গুটিয়ে নেবে নিজেদের, কিন্তু তা হবার নয়। রাজকুমাররা চিরকাল নিজেদের জেদকে, অহংকারকে যে কোনো ইচ্ছেকে বজায় রাখতে শিখেছে, দায়িত্ব-জ্ঞান বলে কোনো ব্যাপারের ধারে-কাছেও যায়নি কখনো—তাই ঐ কাণ্ডটা করতে পারল।

তারা আরো ভেবেছিল যে, সুশিক্ষিত যুদ্ধপটু সৈন্যদলের কাছে সাধারণ যুদ্ধ-শিক্ষাশূন্য মানুষেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবে। দু-একজনকে পড়তে দেখলেই চম্পট দেবে। রক্ত দেখলেই ভয় পেয়ে তাড়-খাওয়া শেয়ালের মতন দৌড় দেবে। কিন্তু তারা বৈদ্যশাস্ত্রী পুণ্যব্রত আর গণদেবদের শিক্ষাদীক্ষা দেবার পদ্ধতির খবর রাখতে না, তাই ঐ ধরনের পাগুলে কাণ্ড করে বসতে পারল।

প্রধান সেনাপতির আদেশের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন একপাল ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ পাহাড়ীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনে যাকে পায় তলোয়ারে টুকরো-টুকরো করে, বল্লমে গেঁথে ফেলে!

এক হঠাৎ আক্রমণের প্রথম চোটে কয়েকজন পাহাড়ী টুকরো-টুকরো হল, ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে গেল মাটিতে, রক্তের ফোয়ারা ছুটল স্বয়ংবর সভায়। পাহাড়ী সর্দার বল্লমের খোঁচায় মাটিতে পড়ে গেল, তার বাঁশি ছিটকে কোথায় চলে গেল কে জানে!

বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে এবার পাহাড়ীরা ভয়ংকর মারমূর্তি ধরল। সর্দার শুয়ে শুয়েই হাঁক পাড়ল—মারটা ফিরিয়ে দাও হে! প্রাণটা লুটিয়ে দাও! কাঁড়া চালাও!

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারির ধানুকীরা বিষ-তীর ছাড়ল একসঙ্গে দুশো। সট্-সট্, শন্-শন্, ফস্-ফস্, চোঁ-চোঁ! শব্দ উঠল শুধু·····।

দুশো তীর শ' দেড়েক সৈন্যকে মাটিতে লুটিয়ে ফেলে দিল প্রথম চোটেই। যেন সাপের কামড়! ইয়া-ইয়া তাগড়াই সব সৈন্য এক-ঘায়েই স্থির!

সর্দারের গলা শোনা গেল—সাতনলী ছাড়ো হে! এবারে চলল বাঁটুল! পাথর ছোঁড়া ধনুক! এক-একটা ধনুক থেকে সাত-সাতটা পাথর ছুটে গিয়ে মাথায় গায়ে যেখানেই লাগুক হাড়গোড় ভেঙে দেবে! মাথা ফাটিয়ে চৌচির করে দেবে! তাই দিতে লাগল। ধনুক আর বাঁটুলের আক্রমণে রক্ষীবাহিনী থমকে যেতেই সর্দার আবার হাঁকল—আবার কাঁড়!

এবারে দ্বিতীয় সারির ধনুকধারীরা একসঙ্গে একশো বিষ-তীর ছাড়ল। বহু সৈন্য পড়ে গেল ঘোড়া থেকে—অনেক ঘোড়াও আছড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

এবারে সড়কি ক্যাঁচা নিয়ে তাড়ো হে!

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচা সড়কিধারীরা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি রক্ষীবাহিনীর ওপর। যাকে সামনে পায় সড়কি দিয়ে গেঁথে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়, ক্যাঁচা দিয়ে গেঁথে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ে। মারের চোটে রক্ষীবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সভামধ্যে চলল হুলুস্থুল কাণ্ড! কে যে কোনদিকে পালাবে, পালিয়ে প্রাণটিকে বাঁচাবে তার ঠিক-ঠিকানা

পেল না। ভয়ের চোটে অতিথি রাজপুত্র আর রাজারা এলমেলো দৌড়ুতে লাগল। তাদের মাথা থেকে মুকুট-পাগড়ি খুলে রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে খেতে পেছনের পলাতকদের পায়ের চাপে ভেঙে, তুবড়ে, সে এক কিম্ভূত-কিমাকার কাণ্ড হতে লাগল! তাদের ভাল-ভাল পোশাকগুলো খুলে গেল, মণিমুক্তোর মালাগুলো, গায়ের গয়নাগুলো খুলে ছিঁড়ে রাস্তায় ছত্রাকার হয়ে গড়াতে লাগল! তাদের অনেকের কাপড়ের কাছা-কোঁচা খুলে গেল হঠাৎ দৌড়ের চোটে। ধুলধুলে পোশাকে তখন তাদের একটাই কাজ উল্টো দিকে ভোঁ-দৌড়! মুখে তাদের কয়েকটা মাত্র শব্দ—বাপ্‌স্! কাজ নেই বাবা, রাজকন্যার ওপর লোভ করে! কাজ নেই বাবা, পালা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম—পালা—পালা—পালা!

ব্যাপারটা ঘুরে গেল দেখে প্রধান সেনাপতি, মহামন্ত্রী আর রাজকুমারদের চোখ কপালে উঠে গেল। একি রে বাবা, এখন আমাদেরও প্রাণটা যায় যে! এতটা তো ভাবা যায়নি। সাধারণ মানুষ এমন যুদ্ধ শিখল কবে? কে শেখালো? রাজত্ব করার নিয়ম তো সাধারণ মানুষকে অশিক্ষিত, বিশৃঙ্খল আর একতাহীন রাখা। আমরা তো তা সাধ্যমত রেখেছিলাম এতদিন। তাহলে? আর ভাবার সময় কোথায়? রাজকুমাররা ইতিউতি তাকাতে লাগল। মহামন্ত্রী আর প্রধান সেনাপতিরও সেই অবস্থা। তাদের একমাত্র চিন্তা তখন একটা করে ভাল ঘোড়া পেলেই প্রাণটা রক্ষা হয়! পালিয়ে বাঁচা যায়! কিন্তু ঐ গোলমালে কোথায় ঘোড়া কোথায় কি? একমাত্র ভরসা ছুটি করে পা! তাতে চেপে উল্টো দিকে চোঁ-চোঁ দৌড়।

তারা যেই না তাই করার জন্যে মঞ্চের পেছনে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি চারদিক থেকে পাহাড়ীরা সড়কি ও কাঁচা উঁচিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল।

এত কাণ্ডটি করেক পালাবেক? সিটি হচ্ছেক লাই! একজন

বলল। মহামন্ত্রী আর প্রধান সেনাপতির বুকে ক্যাঁচা ঠেকিয়ে দু'চার-জন বলল—নড়লেই ওটি বুকে গিঁথে যাবেক! বাইর করতে লারবেক! তবে—প্রাণটা বাইর করতে পারবেক গো বাবুমশায়রা!

রাজকুমারদের ঘিরে একজন বলল—যে কম্মটি করেছক পাপের শাস্তিটি লিতেই হবেক! এবার যাবেক কুথা? কেউ বলল—দে গেঁথে—দে! কেউ বলল ছেঁচে দে! কেউ বলল—পেড়ে ফ্যাল না কেনে!

এই যখন অবস্থা, ওদের শেষ করে দেয়-দেয়, তখন মঞ্চের ওপরে লাফ দিয়ে উঠল সেই সন্ন্যাসী, গলায় তার রাজকন্যার দেয়া বকুল ফুলের মালা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে উঠলেন বৈদ্যশাস্ত্রী আর পুণ্যব্রত শাস্ত্রী।

সন্ন্যাসী-বেশী গণদেব গম্ভীর গলায় বলল—দাঁড়াও! ওঁদের ওপরে নিয়ে এস! দেখ যেন আঁচড়টি না লাগে কারুর গায়ে! সুবিচার চাই! গুরুদেব বৈদ্যশাস্ত্রী আর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য দ্বিতীয় গুরু পুণ্যব্রত শাস্ত্রীর ওপরেই ওঁদের ভার এখনকার মতন ছেড়ে দাও!

সঙ্গে সঙ্গে কলের পুতুলের দম ফুরিয়ে গেলে যেমন সেটা থেমে যায়, তেমনি ঐ বিরাট জনতা, পাহাড়ী যোদ্ধারা থেমে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন শুধু বলল—তাই হবে! আমরা ল্যাঝ্য বিচারই চাই!

বৈদ্যশাস্ত্রীর নির্দেশে ওঁদের মঞ্চের ওপরে তুলে আনা হল। পুণ্যব্রত শাস্ত্রী কয়েকজন সন্ন্যাসী সেবাব্রতীকে দিয়ে বল্লমের খোঁচায় আহত পাহাড়ী সর্দারকে ওপরে আনিয়ে শুশ্রূষা আর চিকিৎসা করতে লাগলেন। বললেন সেবাব্রতীরা, সমস্ত আহতদের সেবা কর প্রথমে, চিকিৎসা কর! শত্রুমিত্র ভেদ কোরো না!—

সেবাব্রতীরা এবং সাধারণ মানুষেরাও সেবার ও চিকিৎসার কাজে লেগে গেল।

এদিকে যে সব অমাত্যরা পালাচ্ছিলেন, তাঁদেরও ফিরিয়ে এনে

বসানো হল—অতিথি রাজাদের মধ্যেও যাদের পাওয়া গেল, তাদেরও ফিরিয়ে এনে বসানো হল।

সবাই বসে গেলে পুণ্যব্রত শাস্ত্রীর অনুরোধে বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন—রাজকুমার মকর, কুবের, তোমরা তো নিজেরাই রাজা হয়ে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ! অনেক জঘন্য অপরাধ তোমরা আগে থেকেই করেছ, করে যমজ-রাজা হয়ে বসেছ, বসে আবার করছ!—এখন বলো তো, কেন তোমরা স্বয়ংবর সভায় রাজকন্যা মালা দেয়া সত্ত্বেও সেটাকে উল্টে দিতে চাইলে?

—কারণ? কুবেরজিৎ বলল—রাজকন্যাকে তুক্ করে, বশ করে, ভুল পথে চালিয়ে, একজন ভিখিরীকে মালা দিইয়ে আমাদের মান-মর্যাদা একেবারে নষ্ট করা হয়েছে, বংশে কালি ঢালা হয়েছে! এ সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল, সহ্য করা মহাপাপ!

—কি করে জানলে যে ওকে তুক্ করে, বশ করে, ঐ কাজ করানো হয়েছে? বৈদ্যশাস্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

—একথা বোঝার জন্যে মাথা খুঁড়তে হয় না, যে কোনো বোকা লোকও বুঝতে পারে! শুনুন, আমাদের বোন আদর্শ মেনে চলে। সে একনিষ্ঠ! সে একজনকে মনে মনে বরণ করেছিল আগে। সেবারের স্বয়ংবর সভায় তাকে নেমন্তন্ন করা হয়নি বলে সে মালা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে মত পাল্টাবার মেয়েই নয়। তুক্‌তাক্ বশীকরণ না হলে সে সম্পূর্ণ অন্য একজন সন্ন্যাসীকে কিছুতেই মালা দিতে পারে না!

—ঐ সন্ন্যাসী যদি সেই ছেলে হয়? হতে পারে তো? আমরা আর কতটুকু চিনি বলো? বৈদ্যশাস্ত্রী হাসি-হাসি মুখে বললেন।

—হতেই পারে না! আমাদের মুঠো অত আল্‌গা নয়, সেই ছেলেটাকে আমরা দুর্গম জায়গায় হাতে-পায়ে-গলায় শেকল দিয়ে বন্দী করে রেখেছি! সে ছেলে মাছি হতে পারলেও সেখান থেকে আসতে পারবে না!

—যদি সেই ছেলেই হয়? বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন।

—অসম্ভব! কি সেনাপতিমশাই, তাই না?

সেনাপতি উত্তরাঞ্চলের সেনাপতির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি তাই না? সে তো বন্দীই আছে?

—এঁ্যা? হ্যাঁ। তা—তা—তাই।

উত্তরাঞ্চলের সেনাপতির চোখ কপালে উঠে গেল।

বৈদ্যশাস্ত্রী রাজকন্যার দেয়া মালা পরা সন্ন্যাসীর দিকে হাত তুলে ইশারা করলেন। পুণ্যব্রত শাস্ত্রী এগিয়ে সন্ন্যাসীর মাথা থেকে পরচুলা, জটা আর গালের চাপ-চাপ ঝুট-দাড়ি টেনে খুলে নিলেন হঠাৎ। গায়ের ওপর থেকে গেরুয়া চাদরখানাকেও টেনে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে!

ব্যস্! একটা কাণ্ড! এদিকে হৈ চৈ আনন্দ! পাথরও যেন নড়েচড়ে উঠল, আর এদিকে অতিথি রাজপুত্ররা, রাজকুমাররা, অমাত্যরা দেওদার গ্রামের লোকেরা, সামন্ত সিং আর সেনাপতিরা, মন্ত্রীরা সবাই যারা একটু আগেও জ্যান্ত ছিল—পাথর হয়ে গেল যেন সবাই। ফ্যাল ফ্যাল করে কপাল থেকে তাকাতে লাগল। কারণ চোখগুলো আগে থেকেই কপালে উঠে বসেছিল

কেবল কুবেরজিৎ ওরই মধ্যে উত্তরাঞ্চলের সেনাপতির দিকে কটমট্ করে তাকিয়ে বলল—সেনাপতির প্রাণদণ্ড!

জনতার আনন্দধ্বনি একটু কমলে কুবেরজিৎ আবার বলল—কিন্তু আমাদের দেবতার মতন পিতা, এ রাজ্যের ইন্দ্রের মতন রাজা মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী ধনপতি বাহাদুর এ বিয়ে চান না! সর্বস্ব পণ করে এ-বিয়ে বন্ধ করেতে বলে তিনি তপস্যায় গেছেন। তিনি ফিরে না এলে কিছুই হবে না। তাঁর আদেশেই এ বিয়ে ভেঙে দেয়া হল।

ওর কথার পিঠে মকরকুমার বলল—ততদিন যেমন ছিল তেমনি চলুক। যে যার কাজে যাক! রাজাধিরাজ ফিরে এসে রাজ্যের ভার নিন্, তারপরে তিনি যা বলবেন তাই হবে।

—রাজাধিরাজকে কোথায় রেখেছ তোমরা? বৈদ্যশাস্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

—তিনি স্ফটিক সমুদ্রের ধারের আশ্রমে অবসর যাপন করছেন

—শুনতে পাই চারিদিকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখা হয়েছে? তোমাদের দেবতার মতন বাবামশাইকে বন্দী করে রাখনি তো? বৈদ্যশাস্ত্রী আবার বললেন।

কুবেরজিৎ—না, না! তা কি করে হয়? তাঁর নির্দেশেই ঐ ভাবে রাখা হয়েছিল! গুপ্তচরেরা খবর দিয়েছিল যে, দুর্ধর্ষ পাহাড়ী ডাকাতরা তাঁকে হরণ করবে, না হয় হত্যা করবে! তাই নিরাপত্তার জন্যে—!

পুণ্যব্রত—তারপর? তিনি? স্বয়ংবর সভায় আনা হয়নি কেন তাঁকে?

মকরকুমার—তারপরে উনি নিজে নীলমুকুট পাহাড়ের চুড়োয় তপস্যা করার বাসনা জানালেন। সেখানকার এক দুর্গম গুহায় উনি তপস্যা করছেন।

কুবেরজিৎ, তাই না সেনাপতি সিংহবিক্রম সিংহ?

ওর কথা শুনে গুলি-গুলি লাল-লাল চোখ লোহার ভাঁটার মতন এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে, দুর্গা ঠাকুরের অসুরের গোঁফ চুমরে, পাগড়ির ভেতরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে, সিংহবিক্রম সিংহ হেঁড়ে গলায় বললেন—এ্যা—এ্যা! তা—তা—! হ্যাঁ—হ্যাঁ—! তাই তাই—!

বৈদ্যশাস্ত্রী একটু হেসে পুণ্যব্রতকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

পুণ্যব্রত সন্ন্যাসীদল যেখানে বসেছিলেন সেখানে কাকে কি যেন ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর দল মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাঁদের মাঝখানে এক প্রবীণ সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনীকে ঘিরে এগিয়ে আসতে লাগলেন। 'সত্য শিব সুন্দর তোমার আলো দাও! বেরিয়ে এসো"—এইসব মন্ত্র গান করতে করতে তাঁরা মঞ্চে এসে উঠলেন।

এ আবার কি বৈদ্যশাস্ত্রী? কুবেরজিৎ জিজ্ঞেস করল· আপনি কি এখানে সেই তুকতাকের খেলা দেখাবেন—না নাটক করবেন ঠিক করেছেন?

বৈদ্যশাস্ত্রী—জীবনটাই নাটক ছোটকুমার ! দেখ, ঠিক কিনা ? উনি দু'বার হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারদের, সেনাপতিদের, মন্ত্রীদের, অমাত্যদের, সাধারণ মানুষদের, অতিথিদের চোখের সামনে আবার এক আশ্চর্য ঘটনা, একটা ইন্দ্রজাল, একটা নাটকের চরম দৃশ্য ফুটে উঠল !

সন্ন্যাসীরা ততক্ষণে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে গেছেন, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শাদা ধবধবে গোঁফদাড়িতে ভরা, উজ্জ্বল মুখের সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী আর আগুনের মতন তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনী।

বৈদ্যশাস্ত্রী এগিয়ে সন্ন্যাসীর মাথা থেকে দুধের মতন পরচুলা, আর মুখ থেকে বকের পালকের মতন ঝুট-দাড়ি খুলে নিলেন। গা থেকে টেনে নিলেন গেরুয়া চাদর।

সেই সবের আড়াল থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখে সবাই হতবাক ! রাজকুমাররা 'থ'। সেনাপতিদের হাড়গোড় ভাঙা 'দ'। আর মহামন্ত্রীর, সেনাপতিদের, অমাত্যদের হ-য-ব-র-ল অবস্থা।

ততক্ষণে প্রবীণ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর মাথা থেকে শাদা মেঘের মতন পরচুলাটা খুলে নিয়েছেন।—একি, একি ! কি দেখি—! সেকি, সেকি !

এ যে রাজা ধনপতি-ই-ই-ই ! আর-র-র-র ছোটরানী ই-ই-ই-ই ! মেকি, মেকি হয়তো ? ভূত দেখলেও বোধ হয় মানুষ এত ভয় পায় না। ভূত তো ভূত, খারাপ ভাবব্যাতের কথা জানতে পারলেও মানুষ এত কাতর হয় না। রাজকুমার আর মন্ত্রী সেনাপতিদের কাছে বর্তমানটা বর্তমান হয়ে দেখা দিল যেন ! হতাশার, ভয়ের গর্তের মধ্যে তারা যেন তলিয়ে যাচ্ছে ! ওরই মধ্যে কারুর সন্দেহও জাগছে—মেকি, মেকি নয়তো ? কুবেরজিৎ শুধু দাঁত কিড়মিড় আর চোখ কটমট করে পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি সিংহবিক্রম সিংহের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার গলা কাটা হবে ! কচুপাতার ডগা কাটার মতন আমি নিজে হাতে কাটব, কুচ করে। শয়তান, ধাপ্পাবাজ !

বৈগুশাস্ত্রী বাপুহে, তোমরা নিজেরা কি? সেনাপতিরা চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে এই যা! বাঘের ঘরে ঘোগেরা বাসা করেছে, এই আর কি? তোমাদের মতন ভণ্ড, শয়তান, ধাপ্পাবাজ, মিথ্যেবাদী আর কেউ আছে? কি মকরকুমার, কুবেরজিৎ?

একজন গ্রামবাসী এগিয়ে এসে বলল—গুরুদেব, উদের নামটি ভুল বলিছেন আজ্ঞে! উরা মর্কটকুমার আর কুমড়োজিৎ। মর্কটের সঙ্গে পাল্লাটি দিয়ে উনি বাঁদরামোটি ভাল মতেই করেন আর এক হাজার কুমড়োকে দু'খানা করে কেটে উনি হইছেন গিয়ে কুমড়োজিৎ!

একথা শুনে সভার সবাই হোঃ হেঃ, হিঃ হিঃ, হাঃ হাঃ, হুঃ হুঃ হেসে আকাশ ফাটিয়ে দিতে লাগল। বৃষ্টি যেমন একদিক থেকে আর দিকে এগিয়ে যায় ঝমঝম শব্দ করে, ঐ বিরাট সভার একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত হাসির হররা ছুটতে লাগল—হিঃ হিঃ, হুঃ হুঃ, হাঃ হাঃ, হোঃ হেঃ!

তারপরে সবাই চীৎকার করে উঠল—ওদের অন্যায়ের জন্যে, অত্যাচারের জন্যে, শয়তানীর জন্যে, জঘন্য অপরাধের জন্যে, ওদের শূলে চড়ানো হো-ও-ও-ক!

ব্যাপার-স্যাপার দেখে কুবেরজিৎ, মকরকুমার আর মহামন্ত্রী হঠাৎ রাজা ধনপতির পায়ের ওপরে আছড়ে পড়ল। রাজার পা জড়িয়ে ধরার জন্যে সেকি কাড়াকাড়ি! পা ধরে কি টানামানি! পা টানার চোটে রাজামশাই পড়ে যান আর কি!

—ক্ষমা করুন মহারাজ! এবারের মতন ক্ষমা করে দিন! আপনি না ক্ষমা করলে আমাদের রক্ষে নেই। সবাই এক সঙ্গে বলতে লাগল। ওদের কাণ্ড দেখে সভার সব লোক হৈ-হৈ করে উঠল। কেউ কেউ ওদের গলা নকল করে বলতে লাগল—ক্ষমা করুন মহারাজ! এবারের মতন ক্ষমা করে দিন! তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল—এই দিচ্ছে ক্ষমা করে। জনতা উত্তাল হয়ে উঠছে দেখে গণদেব হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বলল। সভা শান্ত হলে পুণ্যব্রতশাস্ত্রী

বললেন—রাজামশাই যখন এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন, তখন উনিই বিচার করবেন কি করা উচিত। এখন রাজকন্যা লক্ষ্মীকে এখানে নিয়ে এস।

রাজকন্যা বাসমতী গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে বসেছিল হরদেব মাঝির পাশে। ঘোষণা শুনে বাসমতী গ্রামের লোকেরা শোভাযাত্রার মতন করে রাজকন্যাকে ঘিরে সভামঞ্চে পৌঁছে দিয়ে গেল। মঞ্চে উঠে রাজকন্যা মা, বাবা, বৈদ্যশাস্ত্রী, পুণ্যব্রত, গণদেব ও রাজকুমারদের প্রণাম করল। দেখে মনে হল যেন জলচৌকিতে লক্ষ্মীঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন সবাই শান্ত হলে রাজামশাই গম্ভীর গলায় বললেন—আপনাদের শুভেচ্ছায় আর সাহায্যে আমি নতুন জীবন পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি, সুখ পেয়েছি, জীবনের চরম আনন্দ যে কি তা জেনেছি!

অপরাধীরা দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে। এখন আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এ-ধরনের অপরাধ আর যেন কেউ কোনো দিন সুবর্ণদ্বীপে না করতে পারে।

এখন আমি রাজকুমারদের কয়েকটা প্রশ্ন করছি। ওরা খুব জোর গলায় প্রশ্নের উত্তর দিক যাতে সবাই শুনতে পায়।

রাজকুমার মকর, কুবের, তোমরা জমি চাষ করতে পার? লাঙল দিয়ে বীজ বুনতে পার? ফসল ফলাতে পার? করতে দিলে পারবে?

মকরকুমার ও কুবেরজিৎ বলল—না, পারি না! জানি না, পারবও না কখনো।

রাজা—খনি থেকে সোনা হীরে, সমুদ্র থেকে মুক্তো তোলার কাজ জান? পার? শোধন করে ধাতু তৈরি করতে জান? পার? করতে দিলে পারবে?

মকর ও কুবের—না, জানি না, পারবও না!

রাজা—সুতো কাটতে পার, কাপড় বুনতে জান, পার? শিখিয়ে দিলে পারবে?

মকর ও কুবের—না—না।

রাজা—তাহলে কি জান, কি পারবে?

মকর ও কুবের—শিকার করতে জানি, পারি, যুদ্ধ করতে জানি, পারি! রাজ্যশাসন করতে জানি, পারি। ঘোড়ায় চড়তে, রথ চালাতে জানি, পারি।

রাজা—শুধু আদেশ করে, লোকজনকে করতে বলে রাজ্যশাসন জান! এই এক বছরের তা প্রমাণ করেছ। নিজেরা কিছুই করোনি, দেখনি। আর যুদ্ধ করতে, সাধারণ মানুষ তোমাদের চেয়ে ভাল পারে। তোমরা তো পেছন থেকে যুদ্ধ করো, ওরা সামনে গিয়ে করে। একটা কথা চেপে গেছ! আমোদ-প্রমোদ ফুর্তি করতে পার!

সভার লোকেরা বলল—ঠিক ঠিক বলেছেন রাজামশাই! আর প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাতে জানে ও পারে, এবং দুর্বল অস্ত্রহীনের সঙ্গে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে জানে! সেটি বলেনি আজ্ঞা—রাজকন্যা লক্ষ্মী আমাদের সঙ্গে চাষবাসের কাজ, খনির কাজ, কাপড়ের কাজ সব কাজ করিছেন আজ্ঞা!

রাজা—যাই হোক, এখন শোন! সুবর্ণদ্বীপের আসল সম্পদ তার ফসল আর খনির ধাতু, তুলো, কাপড়চোপড়, রেশম, ফলমূল, মশলা এইসব। এইসব থেকেই অর্থ হয়, আর তাতেই তোমরা বিলাসিতা কর। অথচ ঐসব সম্পদ তৈরির ব্যাপারে তোমরা কিছুই জান না, করো না, কিছু করবেও না। যারা ঐ সম্পদ তৈরি করে, বাড়ায়, তারাই দেশের আসল কাজ করে। তোমরা সেই সব ব্যবহার করে খরচ কর, অপচয় কর। যারা দেশের সম্পদ তৈরি করে, দেশকে বাঁচিয়ে রাখে, সমৃদ্ধ করে, তারাই আসল মানুষ, তাদেরই দেশ। তাদের কথায় তাদের ইচ্ছেয়, তাদের মনের মতন রাজা হওয়া চাই। আমি ঘোষণা করছি, এখন থেকে এ রাজ্যে রাজার ছেলেমেয়ে হলেই রাজা বা রানী হতে পারবে না কেউ! যোগ্য, মনের মতন লোককে দেশের

লোক নির্বাচন করে সিংহাসনে বসাবে। রাজার পদ আজ থেকে উঠে গেল। দেশের মানুষেরা চার বছর অন্তর দু'জন মানুষকে নির্বাচন করে নেবে। এঁদের একজন হবেন দেশপ্রধান আর একজন দেশনায়ক। দেশনায়কই শাসন চালাবেন। তিনি মনের মতন মন্ত্রী, অমাত্য, সচিব এই সব বেছে নিয়ে রাজ্যশাসন করবেন। দেশপ্রধান পরামর্শ দেবেন, আদেশনামায় সই করবেন।

দেশের সব মানুষ যোগ্যতা মতন কাজ পাবে, করবে। রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করে নেয়া হবে। মকর-কুমার ও কুবেরজিতের দলবলের অপরাধের কি দণ্ড তা দেশপ্রধান এবং এবং দেশনায়কই ঠিক করবেন। আমি এই মুহূর্তেই রাজার পদ ত্যাগ করলাম। এখন থেকে দেশের আশ্রমে কাজ করব। সেই হবে আমার অবসর। রাজবৈদ্য, রাজগুরু, বৈদ্যশাস্ত্রী দেশের মানুষের মত জেনে, ঘোষণা করে জানাবেন দেশের লোকেরা কাকে দেশপ্রধান আর দেশ-নায়ক করছেন। আর একটা কথা রাজকন্যাকে ইচ্ছেমত স্বামী বরণ করতে বলা হয়েছিল। স্বয়ংবর সভা মানেই তাই। রাজকন্যা যা করেছেন তার ওপর কারুর কিছু বলার অধিকার নেই!

রাজার ঘোষণায় সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। মকর-কুমার কুবেরজিৎ আর মহামন্ত্রীর শুধু গালগুলো ঝুলে পড়ল। তারপরে বৈদ্যশাস্ত্রী এসে বললেন—আমি আর আমার প্রিয়শিষ্য পুণ্যব্রত স্বর্ণ দ্বীপের গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের মনের খবর নিয়েছি। ঠিক হয়েছে কিনা এখন তোমরা বলবে। আমি প্রস্তাব করেছি, আজ থেকে এই সোনার দেশের দেশপ্রধান পদে বসবেন মা-লক্ষ্মী মণিদীপা! আর দেশনায়কের পদে শাসনভার নেবেন জনগণের নেতা গণদেব। বলো, তাই হবে কিনা?

সভার সবাই হৈ হৈ করে বলল—হ্যাঁগো কর্তা! মনের মতনটি হইছে! তারপরেই চড়াচ্চড় হাততালি। পাহাড়ীরা আবার নাচ-গান আরম্ভ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আনন্দধ্বনি নাচ-গান একটু কমলে পুণ্যব্রত বললেন—তাহলে আজ থেকে এদেশে জন-শাসন চালু হল। এখন, রাজা দেশনায়ক গণদেবের হাতে আদেশ-পত্র দিয়ে দেবেন। তারপরে সাতদিন ধরে চলবে গণদেব আর লক্ষ্মীর বিবাহ-উৎসব।

রাজামশাই এগিয়ে এসে গণদেব আর মণিদীপার হাত একসঙ্গে করে তাদের হাতে আদেশ-পত্র দিয়ে রাজ্যের ভার দিয়ে দিলেন। ওরা রাজামশাইকে প্রণাম করল। উলুধ্বনি উঠল মঞ্চের পেছন থেকে, সানাই বাজল, কোথা থেকে ওদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

আদেশ-পত্র নিয়ে এগিয়ে এসে গণদেব বলল—এবারের মতন রাজকুমারদের, তাদের সঙ্গীদের ক্ষমা করে দেয়া হল। ওঁরা ওদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বা দায়িত্ব পাবেন এ প্রতিশ্রুতি আমরা দিলাম। আমরা যুদ্ধ করতে জানি, যুদ্ধের জন্যে তৈরিও থাকি। কিন্তু ক্ষমা, অহিংসা আর ভালবাসাই আমাদের রাজত্বের মূলমন্ত্র। সকলে গণদেবের কথায় সায় দিয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠল—ঠিকই বলিছে! আমাদের ব্যাটার বুকের পাটা কত ঠিকই করিছে হে! গ্রামবাসীরা সকলে বলল। নাচগান আনন্দধ্বনি দিয়ে সভা শেষ হল। আমার কথাটিও ফুরুল।

———